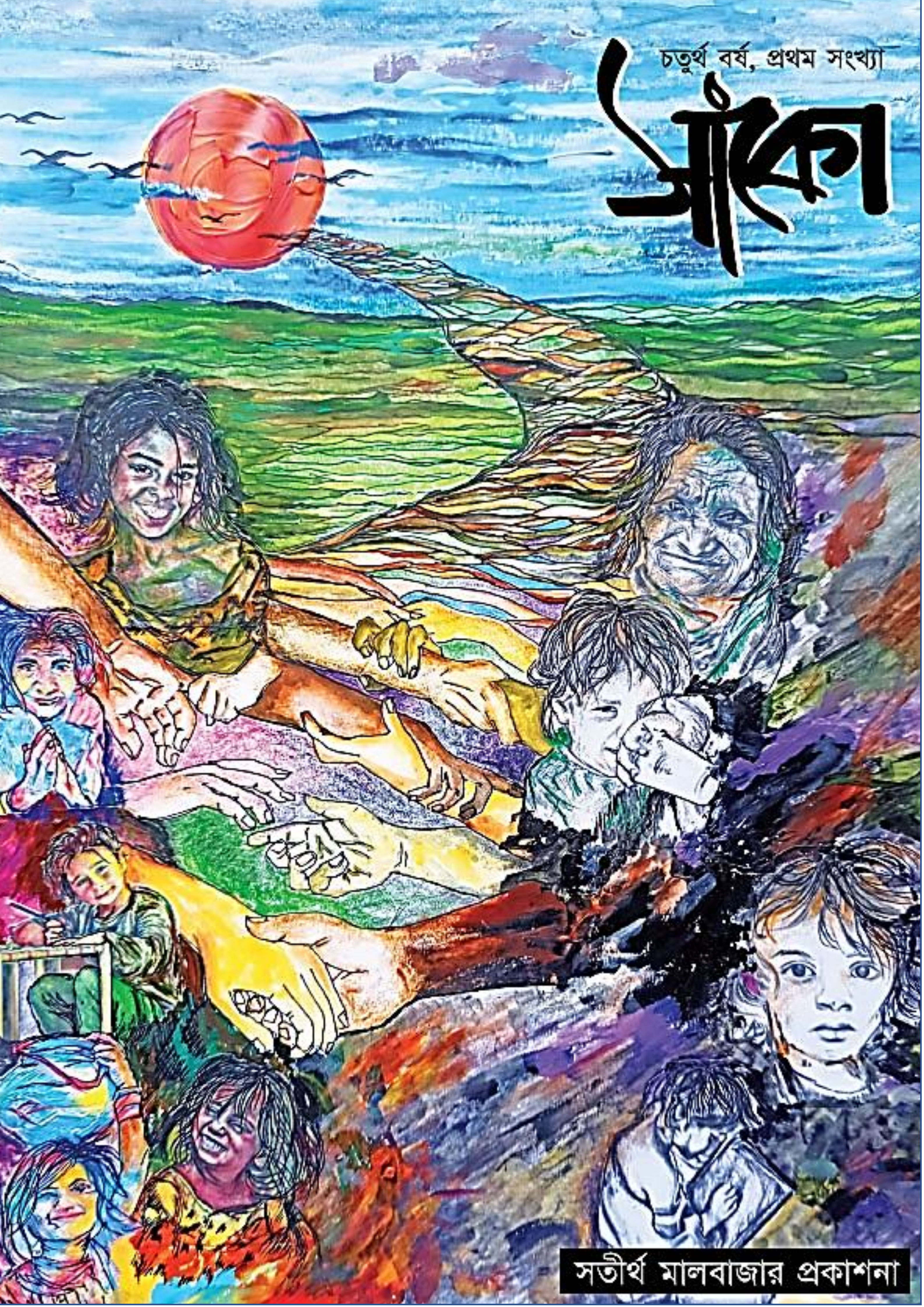
চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
সাঁকো
সতীর্থ মালবাজার প্রকাশনা

With Best Compliments from:

AUDITTECH 360

Mr. Vivek Agarwal (Partner)

✆ : 90880 18820

✉ : vivek.agarwal@audittech360.com

www.audittech360.com

124A Motilal Nehru Road, 1st Floor,

Ashirwad Near Punjabi Garage,

Kolkata, West Bengal, 700029

One point destination for any type of Consultancy Services specialized in CFO Service & Management Audit

সাঁকো

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১০ই এপ্রিল, ২০২২

Email us at:
satirthaemag@gmail.com
satirtha.malbazar@gmail.com

অতিথি সম্পাদক

শ্রী অরূপ বরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও সদস্য বৃক্ষ

শাঁওলি দত্ত

রূপায়ন

রূপম হালদার

সার্বিক সহযোগিতা

রৌহিন, সঞ্জয়, শতরূপা, সুরূপা, সুপর্ণা, মৃণাল, ভাস্বতী, সুজাতা, সংগীতা, প্রীতম, অনিকেত, প্রণব, মুক্তা, গৌতম ও অন্যান্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

শ্রীমতী ইতি পাল, মালবাজার
শ্রী পরাগ মিত্র, শিলিগুড়ি

প্রকাশক

সতীর্থ মালবাজার

সতীর্থ মালবাজার - এর বিভিন্ন প্রকল্পে আপনার যোগদান/ অনুদান কাম্য

মুল্যঃ ৫০ টাকা মাত্র

সংস্করণ উদ্ধৃতি

"তুমি মাটির দিকে তাকাও,
সে প্রতীক্ষা করছে,
তুমি মানুষের হাত ধরো,
সে কিছু বলতে চায়।"

- বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

চলার পথে যাদের হারিয়েছি		৪
সম্পাদকীয়		৫
উত্তর সম্পাদকীয়		৬
অতিথি সম্পাদকের কলম		৭
সভাপতির কলম		৮
সতীর্থ সম্পাদকের কলম		৯
পরশপাথর		
ঋদ্ধিমান সাহার সাক্ষাৎকার	শতরূপা মুখার্জি	১২
প্রত্যুষা		
মেঘের ভেলা	প্রশস্তি পাল	১৭
A Bright Day	Shomili Debnath	১৭
Behind A Cloud	Prabudhaa Mitra	১৮
অঙ্কন		২০ - ২৯
অন্বেষা		
Contusion	Shreyacee Majumdar	৩১
শিক্ষক	রেনেসা দাস	৩১
উন্নয়ন	নবীন পাল	৩২
এক্সপ্লোর	ঋষিকা সূত্রধর	৩৩
Crime and fair sex- Marie Sukloff, Bonnie Parker and Phoolan Devi	Ritaja Dutta	৩৮
মগজাস্ত্র		
শব্দছক	-----------------	৪১
Learn Basic JAVA Programming	Gautam Biswas	৪২
দরিয়া		
অভিমান	টুকুন বড়ুয়া	৪৮
আমার চোখে ছেলেবেলার কামাখ্যাগুড়ি স্কুলের কিছু স্মৃতি	ডঃ প্রণব কুমার সাহা	৪৯
ঈশ্বরের মতন	বাপ্পাদিত্য	৫০
অদৃষ্ট	সন্দীপ রায়	৫১
অমৃতা প্রীতম ও পিঞ্জর: দেশভাগের এক মর্মস্পর্শী ইতিকথা	শতরূপা মুখার্জি	৫৮
আমার প্রথম বেনারসী ও আমি	ঋতু মাহান্ত	৬১
কথারা কবিতা হবে	ভারতী ব্যানার্জী	৬২
ঈশ্বর	সনজিৎ	৬২

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

একটা উজাড় করে দেওয়া হাত	সুপ্রিয় সেন	৬২
কাকতালীয়	পরিমল সিকদার	৬৩
ঘড়ি	সুদীপ সরকার	৬৫
প্রিয়ন্তে	অর্ঘ্য ভট্টাচার্য্য	৬৮
ঢেকির শাক	দেবদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯
একটি সাধারণ ঘটনা অথবা একজন বিরল পাখি	সুমন সানা	৭১
২১ শে ফেব্রুয়ারী	স্নেহাশিস দত্ত চৌধুরী	৭৩
ডাস্টবিনের আত্মকথা	সুমনা মিত্র	৭৩
জ্ঞানবৃক্ষের ফল	রৌহিন	৭৪
ভার্সান	সঞ্জয়	৮০
তোমাকে ভুলতে চেয়ে	সঞ্চিতা ভট্টাচার্য	৮৪
মহাভারতের অর্জুন	ঊষা রঞ্জন পোদ্দার	৮৫
অকালবোধিনী তুমি	ইতি পাল	৮৮
আমন্ত্রণ	অরুময় চক্রবর্তী	৮৮
নির্জন পথে প্রান্তরে	সোমনাথ চ্যাটার্জ্জী	৮৯
শীত ও পশমের দিন আজ	সুভান	৯১
অবচেতন	দেবাঙ্গনা বিশ্বাস	৯২
স্মৃতি	ইন্দ্রনীল রায়	৯৪
ফেলে আসা দিনগুলি	শর্মিলা সেনগুপ্ত	৯৫
একটি স্মার্ট কবিতা	চন্দন খাঁ	৯৮
ভালোলাগা	ফরিদা হুসেন	৯৮
সম্প্রদান	সোমা বিশ্বাস	৯৯
ওয়াল আর্ট	সংঘমিত্রা দে	১০২
মোহ	তনুকা জোয়ারদার রক্ষিত	১০৪
যুদ্ধজয়ের শেষে	পরাগ মিত্র	১০৪
পিঙ্কটুথ	সুরূপা	১০৫
গোপন প্রেম	রূপকথা মৌমিতা মন্ডল	১০৮
রঞ্জাবতীর দুপুর	মৌসুমী রায়	১০৯
দীর্ঘ ভাঙনের পর	সুমনা দত্ত	১০৯
বিকেলের ডাক	শতরূপা সান্যাল	১০৯

সতীর্থ কথা

সতীর্থ - এক আবেগের নাম	তন্ময় রঞ্জন দাস	১১১
শুধু তোমায় ভালোবেসে	সঞ্জয়	১১২
যে পথ পেরিয়ে এসেছি	----------------	১১৩
যে পাহাড় ডিঙাতে চাই	----------------	১১৫
সতীর্থ সদস্য তালিকা	----------------	১১৬

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

চলার পথে যাদের হারিয়েছি

স্বর্গীয়া চিত্রা দে

জন্ম: ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ **মৃত্যু:** ১৫ই অক্টোবর, ২০২১

করোনা গ্রাসে আমরা ইতিমধ্যে অনেক প্রিয়জনকেই হারিয়েছি। বিয়োগ ব্যথা যেন কেমন সহজ হয়ে যেতে লাগল এই দুটি বছরে! তবু কিছু মানুষের চলে যাওয়া সহজে মেনে নেওয়া যায় না। তেমনি একজন মানুষ ছিলেন আমাদের চিত্রাদিদিমণি - সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্বর্গীয়া চিত্রা দে। চিত্রাদির পড়াশোনা মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে আর কর্মজীবন কেটেছে সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। সতীর্থ মালবাজার-এর সাথেও এই দু'টি স্কুল জন্মলগ্ন থেকেই জড়িত।

চিত্রাদি মালবাজার সংলগ্ন সোনগাছি চা বাগানে থাকতেন। মাল আদর্শ বিদ্যাভবন থেকে ১৯৫৬ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। ১৯৬০ সালে জলপাইগুড়ির পি. ডি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দেওয়ার পর মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের তৎকালীন পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে ডা. নারায়ণ ব্যানার্জী চিত্রাদিকে শিক্ষকতা করার আমন্ত্রণ জানান। সেই থেকেই সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ১৯৬৫ সালে বেসিক ট্রেনিং সম্পন্ন করেন। চিত্রাদি ১৯৬৯ সালের ১৩ই মে শ্রী অজিত দে মহাশয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কিছুদিন স্কুল কোয়ার্টার, কিছুদিন স্কুলের হস্টেল, এবং পরবর্তীতে শিলিগুড়ির নিজস্ব বাসস্থান থেকে দৈনিক যাতায়াত করে শিক্ষকতা করেন। দীর্ঘ ৪০বছরের কর্মজীবন শেষ হয় ২০০১ সালে। এই ৪০বছরের শিক্ষকতা জীবনে উনি যে কত মেয়েকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন ওনার স্বভাবগুনে! শাসন ও স্নেহের মিশেলে ছাত্রীরা ওনাকে শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারত না। বাইরে থেকে যতটা কঠিন ছিলেন অন্তরে ততটাই কোমল স্বভাবের ছিলেন। দৃঢ় চরিত্র অথচ আধুনিক মনস্ক মানুষ ছিলেন। তাই ছাত্রীদের স্বভাব গঠনেও ওনার অবদান ছিল।

মূলত ইতিহাসের শিক্ষিকা ছিলেন চিত্রাদি। সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভীত গড়তে ওনার অবদান অনস্বীকার্য। ছাত্রীদের পাশাপাশি উনি স্কুলের সহকর্মীদের কাছেও খুব প্রিয় ছিলেন। কর্মবিরতির পরেও ছাত্রীদের সাথে ও স্কুলের শিক্ষিকাদের সাথে যোগাযোগ অটুট ছিল। ৮০বছর বয়সে পরপারে যাত্রা করেন চিত্রাদি। অমৃতভবনে আপনি চিরশান্তিতে থাকুন দিদিমণি।

সতীর্থ মালবাজার-এর পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় দিদিমণিকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সম্পাদকীয়

সুতো ছিঁড়ে উড়িয়ে দিল ঘুড়ি,
বলল হেসে, "নামটি আমার সবুজ, থাকি মায়াপুরী।
মাঠ পেরিয়ে ঐ যে বাঁশের সাঁকো,
যাবে তুমি সেথায়?
মা আমার তিলের নাড়ু দিবে খেতে তোমায়।"

পানশী ঘাটে কাদাজল দু' পা মোর মায়ায় জড়ায়,
এমনি করে রাখবে জড়ায়ে কে আছে কোথায়?
সেও যেন বলে-
"মাটিতে এসো হে পরিপাটি,
তোমার আমার অটুট বন্ধন এটাই আপন বাটি।"

বন্ধুরা, আবার সময় হয়েছে একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের প্রিয় "সাঁকো" গড়বার। ছোট ছোট প্রয়াসের অচেনা টুকরো রঙিন সুতোয় গেঁথে আমরা ঠিক বানিয়ে নেবো আমাদের পথ, আমাদের "সাঁকো"। আমাদের "সাঁকো"য় সকলের সাদর আমন্ত্রণ। বেধে বেধে থাকবার জন্য আমরা যে অঙ্গীকারবদ্ধ, তা আরেকবার প্রমাণ করবো আমরা আমাদের নিজহাতে তৈরি "সাঁকো" কে আবার নতুনভাবে সাজিয়ে, আরো মজবুত বানিয়ে যাতে আমরা অনায়াসে পেড়িয়ে যেতে পারি সকল বাঁধা। সময়ের নিয়ম সে চরৈবতি। সময় যেমন এগিয়ে যায় সাথে পরিবর্তন কে নিয়ে, সাহিত্যও তেমন তার আপন বেগ নিয়ে চলে নতুনের উদ্যেশ্যে। আমরা যে "সাঁকো" বেঁধে চলেছি বারবার, তার চেহারায় নতুন নতুন সংযোজন যেন সেই সময়ের সাথে চলবার অদম্য প্রয়াসের প্রতিফলন। তাই প্রতিবার আমরা একসাথে হই "সাঁকো" বাঁধতে, তাকে সাজাতে।

বাঙলা সাহিত্য সবসময় এগিয়ে থেকেছে সময়ের চেয়ে। বরঞ্চ, সময়কে নতুন ক'রে ভাবতে শিখিয়েছে, চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে নতুনের পসরা সাজিয়ে। আমরাও আমাদের "সাঁকো"তে চেষ্টা করেছি নতুনদের জায়গা দেবার। তবে সে চেষ্টায় আমরা শুধু বাঙলা নয়, ইংরেজিকেও সাথে নিয়েছি এবারের পথ চলায়। ভবিষ্যতে হিন্দিকেও সাথে নেবো আমাদের সাথে, কথা রইলো।

আমাদের " সাঁকো" বাঁধবার লক্ষ্য পূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা বা কোনরকম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আমরা চেয়েছি আমাদের "সাঁকো" বাঁধতে আসুক কচি-কাচার দল। ভবিষ্যতের লেখক-লেখিকা-চিত্রশিল্পী তৈরিতে ব্রতী আমরা। হোক না একটু পাঁচ মেশালি, হোক একটু কাঁচা। কাটুক ছন্দ স্তবকের মাঝে। লাগুক কোথাও বেসুরো গল্পের বুনোট। তবু নতুন অপটু হাতে আর স্বপ্নের রঙীন জরিতে গড়া "সাঁকো" আমাদের প্রাণ। সে প্রাণের স্পন্দনকে না হয় আমরা এগিয়ে রাখি পটু সাহিত্য থেকে।

যে সকল বন্ধুরা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছবি দিয়ে "সাঁকো" সাজিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। আশা করবো যতবার আমরা "সাঁকো" বাঁধবার উদ্যোগ নেবো, আপনাদের সকলকে সাথে পাবো।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

উত্তর সম্পাদকীয়

আরেকটা বছর কেটে গেল অতিমারী, আতঙ্ক, মৃত্যু, অসুস্থতা, উৎসব আর ভার্চুয়াল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। সাঁকো এবার পঞ্চম সংখ্যায় পড়লো। সংখ্যাটি খুব বড় না হলেও অভিজ্ঞতার ঝুলি তার বেশ ভারীই বলতে হবে। এক ভয়ানক অতিমারীকে আমরা গত দুটি সংখ্যা ধরেই সাথে নিয়ে চলেছি। এই অতিমারী আমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিপথ স্তব্ধ করে দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে বহু স্বজন, বন্ধুকে। তবুও আমরা থামিনি। জীবন এক বহতা নদীর মত। তার এক পাড় ভাঙ্গে তো অন্য পাড় গড়ে ওঠে। কোথাও মজে যাওয়া নদীর চরে বিকেলের অলস রোদে মাথা নাড়ে কাশের গুচ্ছ। কোথাও তীব্র জলস্রোতে নিমেষে ভেসে চলে যায় সদ্য বিসর্জন দেওয়া দেবী প্রতিমা। নদী থামতে জানে না, প্রতিকূলতায় গতিপথ বদলাতে জানে শুধু। মানব জীবনও নদীর মতোই "চরৈবতি" মন্ত্রেরই পূজারী। আমরাও প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার নতুন নতুন উপায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে গেছি। চেষ্টা করেছি ওরই মধ্যে নিজে আনন্দ করে, অপরকে আনন্দ দিয়ে বাঁচবার। এই রসদটুকুর নামই তো জীবন, আর অনন্ত বহমানতাই এই জীবনের বৈশিষ্ট্য। সাঁকোও তাই তার নতুন রসদের ডালি নিয়ে আরেকবার সেজেগুজে উঠেছে। তার ডালিতে ভরা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ আর অসংখ্য হাতে আঁকা ছবি। সাঁকোর এই বসন্ত সংখ্যা আপনাদের ভালো লাগলে সেটা সাঁকোর সার্থকতা, সাঁকোর কারিগরদের সার্থকতা। এই কারিগরেরাই সাঁকোর সম্পদ। ছেনি, বাটালি হাতে অসংখ্য কচি কাঁচাদের হাতও বড়দের হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমান তালে মেতে উঠেছে সাঁকো গড়ার আনন্দে। চলার পথে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিও ক্রমশ ভরছে। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' এই আদানপ্রদানের মধ্য দিয়েই আমরা ক্রমশ হেঁটে চলেছি সাবালকত্বের দিকে। কিন্তু গন্তব্যের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে পৌঁছানোর যাত্রাপথটি। সাঁকোর এই যাত্রাপথ আরো মধুর হোক। উত্তরোত্তর বাড়তে থাকুক সাঁকোর পাঠক সংখ্যা। চলার পথে আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সাঁকো সমৃদ্ধ হোক, এই অপেক্ষাই রইলো।

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ,
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে বসন্ত
আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।"

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অতিথি সম্পাদকের কলম

সর্বেষু নিবেদন –

"ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গাঢ়ই" - কথাগুলি হয়তো অনেকের চেনা আবার হয়তো অনেকের অচেনা। কথাটি বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো বই চর্যাপদে আছে। মানে এরকম - ধর্মার্থে চাটিল (কবি) সাঁকো গড়লেন। কবির কথায় ধর্ম মানে হৃদয়প্রীতির আনন্দ। সেই প্রীতির আনন্দ দেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য চাই প্রাণে - প্রাণে যোজনা। সেই যোজনা - প্রয়াসের নামরূপ হলো "সাঁকো", -কর্মরূপ হলো সতীর্থ মালবাজার। "সাঁকো" ও তার সতীর্থবৃন্দকে অফুরান - স্বাগত।

সতীর্থ মালবাজারের সতীর্থরা অবিরত কর্মরত। সংসারযাত্রার ঢালু পথে চলেও তারা গড়িয়ে যায়নি। তারা মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, - প্রথামান্য সাংসারিকতার জগতের সঙ্গে হিতৈষণা- ধন্য নানান অ-সংসারিক কর্মকান্ডের জগতের। তারা সফল থেকে সফলতর হয়ে উঠুক। তাদের ক্রিয়াকান্ড মধুর থেকে মধুরতর হোক।

জীবনচর্যার পথে খোরাকী দু'রকমের। যুক্তি-তর্ক আর গপ্পো। প্রথমটির শেষ কথা সংসার- বৎসলতায়। দ্বিতীয়টির শেষকথা আত্মপ্রকাশ- চাহিদায়। সেই চাহিদার প্রেরণা থেকে "সতীর্থ মালবাজার" অনেকের প্রাণের স্পর্শ খুঁজেছে, খুঁজে চলবে। সেই সুবাদে সেই অন্য "অনেক"- এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ও ঘটবে সতীর্থ মালবাজার প্রকাশনার পাতায়। এভাবেই সতীর্থ প্রকাশনার মুখ পুস্তিকা হয়েছে "সাঁকো"। "সাঁকো"-র সার্থকতা এভাবেই।

যুগপৎভাবে সতীর্থ প্রকাশনা ও সাঁকো - প্রাসঙ্গিক বর্তমান ও আগামী সুজনদের প্রতি আহ্বান রইলো সেবাধর্মের সঞ্চরণকে মধুরতর করে তোলার জন্য, আত্মসৃজনীর বিচিত্ররূপকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, নানা জনের, নানা প্রাণের, নানা ভাবনার মেরুকরণ ঘটানোর জন্য।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সভাপতির কলম

সতীর্থ মালবাজার-এর জন্মলগ্ন থেকেই আমি রয়েছি। মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে তৈরী সংস্থার সদস্য সংখ্যা আজ প্রায় ৮০। খুব কম সময়ের মধ্যে নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে সতীর্থ মালবাজার। মূলত, মাল আদর্শ বিদ্যাভবন ও সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তৈরী এই সংস্থার সদস্যরা দেশের নানা প্রান্তে ও দেশের বাইরে থেকেও নানাভাবে কাজে অংশগ্রহণ করে চলেছে। আশার কথা, বর্তমানে এই দুই স্কুলের প্রাক্তনীরা ছাড়াও উৎসাহী অনেকেই সদস্যপদ নিয়েছেন। আমাদের সাথে বর্তমানে কয়েকজন সেচ্ছাসেবী যুবকও যুক্ত হয়েছেন।

সতীর্থ মালবাজার-এর মূখ্য উদ্দেশ্য বিদ্যা-শিক্ষার প্রসারে ছোটদের সাহায্য করা, পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো। খেলাধূলা, নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও সমাজসেবা ও সচেতনতামূলক কাজ করেছে। করোনা পরিস্থিতির বিধিনিষেধের কারণে কিছু কিছু কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে করোনা দুঃসময়েও সতীর্থ মালবাজার নানাভাবে সমাজের কাজে নিজেদের নিয়োগ করেছে।

সতীর্থ মালবাজার-এর কর্মসূচি মাল ব্লকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া ইতিপূর্বে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের নানান জায়গার মানুষের পাশেও দাঁড়িয়েছে। এবারে সতীর্থ মালবাজার দক্ষিণবঙ্গের কচিকাঁচাদের কাঁধেও হাত রাখতে পেরেছে। সতীর্থ মালবাজার-এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

বিগত কয়েকদিন আগেই আর্থিক-বছর ২০২২-২৩ এর জন্য পরিচালন কমিটি নির্বাচিত হল - নতুন কমিটির সকলকে অভিনন্দন। আশা রাখি, এই কমিটিও সুষ্ঠুভাবে সতীর্থ মালবাজার-এর কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সতীর্থ মালবাজার-এর মুখপত্রিকা সাঁকো। শিক্ষার্থী ও অপ্রতিষ্ঠিত লিখিয়ে, আঁকিয়েদের কথা ভেবেই সাঁকো-র পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে সাঁকো-র সাথে প্রতিষ্ঠিত মানুষেরাও যুক্ত হয়েছেন, এ আমাদের বড় পাওয়া। এবারে তার পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশ পেতে চলেছে - আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা রইল। সাঁকো কর্মীদের আমার অভিনন্দন।

শুভেচ্ছান্তে

শ্রী সুশান্ত কুমার দত্ত
২৬-০৩-২০২২

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সতীর্থ সম্পাদকের কলম

দেখতে দেখতে "সতীর্থ মালবাজার" সপ্ত দ্বারে কড়া নাড়বে। গুটিকয়েক সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা শুরু হয়েছিল, আজ সংখ্যায় প্রায় ছিয়াশি জন ছুঁয়েছে। শুধুই যে সংখ্যায় বড়ো হয়েছে তা নয়, কাজের পরিধিতেও প্রসারিত হয়েছে অনেকটা। "সতীর্থ মালবাজার" সারা বছর যে সব কাজ করে থাকে তা সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের সকলেই ওয়াকিবহাল। তবুও একটু লিখছি সেই নবাগত-নবাগতাদের জন্য যাদের হাতে এবারের "সাঁকো" পত্রিকাটি প্রথম পৌঁছবে। হ্যাঁ, আমরা সতীর্থরা আমাদের অনুভূতিগুলো সবার সাথে কলমে ভাগ করি আমাদের প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকা "সাঁকো" র মাধ্যমে।

প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকেই মালবাজার ও তার সংলগ্ন এলাকায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের সাথে পাঠের সহায়ক নানা বিষয়াদি দিয়ে আসছে। আগামীতেও দেবে। শীতের শুরুতে মালবাজারের প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শীতবস্ত্র (সোয়েটার) এবং এ বছর ছাতা দেওয়া হয়েছে। "সতীর্থ মালবাজার" এ বছর "লায়ন্স ক্লাব অব্ সেবা" এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিশুদের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছিল, সফলতার সঙ্গে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বৈশ্বিক সংকট কোভিডে (২০২০-২১) অনেক পরিবারের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করেছে। ২০২০ সাল থেকে মালবাজারের সৎকারের মাঠে অভ্যাসরত পাঁচজন খেলোয়াড়কে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে সাহায্য করে আসছে বিগত দু'বছর ধরে "সতীর্থ মালবাজার" এবং এই প্রোজেক্টেও আমরা সতীর্থরা সফল। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এ বছর "সতীর্থ মালবাজার" উত্তরবঙ্গের জন্য যে কাজগুলো বরাবর করে আসছে সেই সাথেই দক্ষিণে পাড়ি দিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের একটি অনাথ আশ্রমের শিশুদের জুতো, লেখার সরঞ্জাম, নানা রকম খাদ্য ও বৃদ্ধাদের গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিয়েছে। "সতীর্থ মালবাজার" শুধুমাত্র সেবা কর্মেই নিযুক্ত থাকে সেটা নয়। আগেই একটি ছোট্ট ভূমিকা রেখেছি। "সতীর্থ মালবাজার" ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ প্রজন্ম, মধ্যবয়স্ক, বয়স্ক পাঠকবর্গের বিনোদনের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করে, নামটা সবাই এতোদিনে জেনেই গিয়েছেন "সাঁকো" পত্রিকা, এবার পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সবাই হাতে নিয়ে বই পড়ার পুরনো স্বাদ নতুন ভাবে পাবেন। সবাই পড়বেন। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের ভালোলাগাকে পাথেয় করেই আমাদের পথচলা। এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের "সতীর্থ মালবাজার" এর সদস্য সদস্যাদের ও স্বেচ্ছাসেবক ভায়েদের দিন রাতের নিরলস পরিশ্রম। আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজ সদস্য-সদস্যা ও স্বেচ্ছাসেবক ভায়েরা খুব যত্ন সহকারে ভালোবেসে করে থাকেন। আসলে, নিজের পরিবারকে আমরা সবাই যেমন আদর যত্নে রাখি, "সতীর্থ মালবাজার" আমাদের আরো একটি পরিবার। সদস্যরা সারাদিন নিজের সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে অবসরের সময়টুকু বিশ্রাম না করে খেটে চলেছে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রসরে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সবকটি প্রোজেক্ট ও নানাবিধ কাজ সম্পন্ন হয় "সতীর্থ মালবাজার" এর সদস্য-সদস্যাদের অনুদানে। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের সতীর্থ সদস্য-সদস্যাদের পরিচিত কেউ খুশি হয়ে কিছু অনুদান করেন, কিন্তু বৃহদংশ আসে আমাদের নিজেদের থেকে। বিগত

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ছ' বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র - ছাত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছে। অনেক অসহায়ের সহায় হয়ে উঠেছে। আগামীতেও এই কাজের প্রসার আরো বৃদ্ধি পাবে, এটা নিশ্চিত। এখন সমাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে আরো অনেকরকম চাহিদা তৈরি হচ্ছে। "সতীর্থ মালবাজার" নিজের গতানুগতিক কার্যের বৃত্ত ছাড়িয়েও ভবিষ্যতে নতুন সামাজিক চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসবে। আমরা জনগণের স্বার্থে হিতকর কাজে সবসময় ছিলাম। আছি। ভবিষ্যতেও থাকবো।

"সতীর্থ মালবাজার" সমাজের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান।

"এগিয়ে চলার মন্ত্র মোদের পিছিয়ে পড়ার নয়।
যতই আসুক আঘাত হাজার করবো তাদের জয়।
এগিয়ে চলার মন্ত্র মোদের পিছিয়ে পড়ার নয়।
আমরা জানি একতা আর বিশ্বাসেরই জোর,
জ্বালবো মোরা নতুন সূর্য অন্য নতুন ভোর ।"

আন্তরিক ধন্যবাদ
ভাস্বতী চৌধুরী

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

পরশপাথর

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

"ইন্ডিয়া টিমে প্রত্যেকেই পারফেক্ট টিম ম্যান..."

ভারতীয় ক্রিকেট দলের উইকেটকিপার -ব্যাটসম্যান **ঋদ্ধিমান সাহার** সঙ্গে আলাপচারিতায় *সতীর্থ সদস্যা শতরূপা মুখার্জী*

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহর থেকে ঋদ্ধিমানের ক্রিকেট যাত্রা শুরু। টেনিস বল দিয়ে পাড়ার মাঠে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করা বারো-তেরো বছরের ছোট্ট পাপালি যে একদিন টিম ইন্ডিয়ার সদস্য হবে সেকথা তখন বোধহয় কেউই সম্পূর্ণ ধারণা করে উঠতে পারেননি। লোকাল ক্লাব থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে তিনি খেলেছেন রঞ্জি, আই পি এল এবং অবশেষে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতীয় জাতীয় দলে। তিনি ২০১৪ র আই পি এল ফাইনালে একমাত্র সেঞ্চুরি করেছেন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে। খেলেছেন ভারতীয় জাতীয় দলের হয়ে ৪০টির মতো টেস্ট ম্যাচ, ৯টি ওয়ান ডে ম্যাচ এবং অসংখ্য আই পি এল ম্যাচ। এই মুহূর্তে তিনি ভারতীয় দলে নেই, তিনি সদ্য যোগ দিয়েছেন আই পি এল টিম গুজরাট টাইটান্সে।

ব্যস্ত ঋদ্ধিকে ফোনে আমরা সাঁকোর তরফ থেকে একটি সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব দিই, ঋদ্ধি রাজি হন এবং নির্দিষ্ট দিনে একটি ফোনালাপেই তিনি তার ছোটবেলা, ক্রিকেট ভালবাসা, জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক কথাই আমাদের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারেবারে তার ছোটবেলার শহর শিলিগুড়ির কথাও উঠে আসে।

সাঁকো – সাঁকো পত্রিকার তরফ থেকে আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা, খুবই ভালো লাগছে আজ আপনাকে আমাদের সাথে পেয়ে। একটু ছোটবেলার গল্প দিয়েই আলাপচারিতা শুরু করা যাক। প্রথম ক্রিকেট ভালোবাসা বা ক্রিকেটের সঙ্গে পরিচয় আপনার কিভাবে শুরু?

Image credit: BCCI

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ঋদ্ধি – আমাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আসলে একেবারেই স্পোর্টস রিলেটেড। আমরা থাকতাম শিলিগুড়িতে। আমার বাবা ক্রিকেটের সিজনে ক্রিকেট আর ফুটবলের সিজনে ফুটবল খেলতেন। ফুটবলে গোল কিপিং করতেন আর ক্রিকেটে করতেন উইকেট কিপিং। বাবাকে তো সবসময় চোখের সামনে দেখতামই। সে সময় বাড়িতে টি ভি ছিল না, ফলে অন্য বাড়ি গিয়ে খেলা দেখা, ওয়ার্ল্ড কাপ দেখা, এগুলো চলতই । যখন ১৯৯২এ নিউজিল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড কাপ চলছিল আমরা ভাইয়েরা সবাই মিলে আমাদের দিদার বাড়িতে গিয়ে রাত জেগে সেই খেলা দেখেছি, রাত্তির দুটো-আড়াইটে অবধি জেগে খেলা দেখতাম। এভাবেই শুরু হল ক্রিকেট ভালোবাসা। পাড়ায় এমনিতে টেনিস বল দিয়ে আমরা খেলতাম, দাদা আর আমি দু'জনেই । যখন আমার বারো কি তেরো বছর তখন আমাদের পাড়ায় একটা ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প হ'ল, বাবাকে ওরা ওখানে মেন্টর হিসেবে রাখল, যেহেতু বাবা খেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই কারণে। আমিও সেখানে ভর্তি হলাম। আমি মূলত তখন টেনিস বলে ব্যাটিং আর মিডিয়াম পেস বোলিং করতাম। এইভাবেই ক্রিকেট খেলা শুরু করলাম ।

সাঁকো – প্রথম তাহলে এই কোচিং সেন্টারেই আপনি খেলা শুরু করলেন? উইকেট কিপিংও ওখান থেকেই শুরু?

ঋদ্ধি – হ্যাঁ সেটাই বলছিলাম, ওই ক্যাম্পটা খুব বেশিদিন ওখানে চলেনি। ওদের চার-পাঁচজন কিপার ছিল কিন্তু একদিন কেউ একজন আসেনি। আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল পেছনের দেওয়াল। কিন্তু বল যদি দেওয়ালে লাগে তাহলে তা খারাপ হয়ে যাবে, সেজন্য কাউকে-না-কাউকে তো কিপিং করতেই হবে। সেই কারণে আমিই সেদিন কিপিং করলাম। আমি অনেকগুলো ক্যাচও ধরেছিলাম সেদিন। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম কিপিং করব কিনা। বাবা বললেন যে একদিন নয়, চার-পাঁচদিন করে দেখতে যে আমার কিপিং করতে ভালো লাগছে কিনা। আমার কিপিং করতে ভালো লাগতে লাগলো। বাবাও উৎসাহ দিলেন। তারপর আমি অগ্রগামী ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে জয়েন করলাম, যেটার সাথে আমি এখনও যুক্ত আছি। এরপরই স্টেপ বাই স্টেপ এগোনো শুরু হল।

সাঁকো- এই স্টেপগুলোই পরপর একটু জানতে চাই। অগ্রগামী থেকে আপনার ভারতীয় জাতীয় দলে আসা এই যাত্রাপথটা যদি একটু বলেন -

ঋদ্ধি – প্রথমে আন্ডার ১৩এ আমি দুটো-তিনটে টুর্নামেন্ট খেলেছি এদিক-ওদিকে। সেখানে ভালো করার জন্য আমি স্কুল টিমে সুযোগ পেয়েছি। স্কুলে ডিসট্রিক্ট খেলতে গেছি। আমি শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের ছাত্র। শিলিগুড়ি ডিসট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করেছি আন্ডার ১৬, ১৯ এবং সিনিয়ার টিমে। সবই বলতে গেলে অলমোস্ট একই বছরে।

সাঁকো – এরপরই কি প্রথম যখন রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পেলেন? সেটা কিভাবে হ'ল একটু জানতে চাই।

ঋদ্ধি – অবশ্যই। যারা বেঙ্গলে ডিসট্রিক্ট থেকে ভালো করত তাদের ওরা ট্রায়ালে ডাকতো। সেখানে গিয়ে ট্রায়াল হয়ে, সিলেকশন হয়ে, প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলে প্রথম আমি সুযোগ পেয়েছিলাম আন্ডার ১৯এ। প্রথম বছর একটা আঘাতের কারণে আমি খেলতে পারিনি। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার খেলেছিলাম। ভালো পারফর্ম করায় প্রথমে প্রথম ২৭জনের মধ্যে আমি সিলেক্টেড হই, সেখান থেকে পরের রাউন্ডে ১৪জনের মধ্যে আসি। এরপর রঞ্জি ট্রফিতে ২০০৭/৮এ হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে আমি ১১১ নট আউট করি।

সাঁকো – প্রথম যেদিন ইডেন গার্ডেনসে খেললেন সেদিন ঠিক কিরকম লেগেছিল?

ঋদ্ধি – ইডেনে প্রথম আমি খেলেছি আন্ডার ১৩ একটা টুর্নামেন্টে। একদম বাচ্চারা যেহেতু অতবড় মাঠে খেলতে পারবে না তাই তখন ইডেন গার্ডেনসকে তিনভাগে ভাগ করে নিয়ে খেলা হতো। সেটাই আমার ইডেনে খেলার প্রথম অভিজ্ঞতা। মাঠটাকে তখন একদম কার্পেটের মতো লাগত। ঘাসের কোয়ালিটি এখনকার থেকে অনেক বেশি ভালো ছিল। তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল ওখানে বারেবারে খেলার।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সাঁকো – জাতীয় দলে যখন প্রথম ডাক পেলেন, সেটা তো অবশ্যই খুব বড় একটা পাওয়া, আপনি এবং আপনার পরিবার সেটা কিভাবে গ্রহন করল?

ঋদ্ধি – যেবছর আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, ২০১০এ, সে বছর ডোমেস্টিকে আমার পারফরমেন্স গড়পড়তা ছিল কিন্তু তার আগের বছর আমি খুবই ভালো পারফর্ম করেছিলাম। প্রথম বছর ডাক আসেনি, পরের বছর ডাক পাওয়ার কথা শোনার পরও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। তারপর ফোনে যখন আমাকে কনফার্ম করা হ'ল তখন আমি সত্যি বুঝলাম যে ইন্ডিয়া টিমে আমি খেলার সুযোগ পেয়েছি। খুবই আনএক্সপেকটেড, কিন্তু খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম কিছু একটা করতে পেরেছি যার জন্য ওই ডাকটা পেয়েছি।

সাঁকো – আচ্ছা- এবারে আপনি তাহলে আমাদের ইন্ডিয়া টিমের হয়ে খেলা তিনটে ব্যাটিং পারফরম্যান্স বলুন যেগুলো আপনার কাছে স্মরণীয়। সেগুলো কবে, কোথায়, কাদের সাথে হয়েছিল?

ঋদ্ধি – জাতীয় দলের হয়ে ফার্স্ট ম্যাচটা অবশ্যই মনে আছে, ফার্স্ট ইনিংসে আমি জিরো করেছিলাম, সাউথ আফ্রিকার সাথে খেলা ছিল, সেকেন্ড ইনিংসে আমি ৩৬ করেছিলাম। সেটায় রোহিতের খেলার কথা ছিল, রোহিত আঘাত পাওয়ায় আমাকে শেষ মুহূর্তে খেলানো হয়। সেটা প্রায় বিনা প্র্যাকটিসে খেলা। সেইজন্যই ওটা আরও মনে থাকবে। আরেকটা মনে থাকবে ২০১০এ আমার ফার্স্ট ১০০ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে, সেটায় আমি অশ্বিনের সাথে একটা লম্বা পার্টনারশিপ খেলেছিলাম। সে টেস্টটা আমরা জিতি। আরেকটা ইডেন গার্ডেনসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে, দুটো ইনিংসেই ৫০ নট আউট করে টিম জিতেছিল। এটা ২০১৬ তে। এই তিনটে বলা যায় তিনটে মনে রাখার মতো ইনিংস।

সাঁকো – আপনি তো সব ধরনের ফরম্যাট খেলেছেন- টেস্ট, ওয়ান ডে, টি ২০, এরমধ্যে আপনার সবচেয়ে পছন্দের কোন ফরম্যাটটি?

ঋদ্ধি – আমার অবশ্যই সবচেয়ে পছন্দ শর্টার ফরম্যাট, যেটা আমাকে ভারতীয় দল বেশি খেলায় না, বলতে গেলে খেলায়ইনি। টি ২০তে খেলায়নি। ওয়ান ডে হয়ত ধাপে ধাপে খেলিয়েছে। টেস্টের জন্যই আমাকে ভেবেছিল মূলত, তাই টেস্ট বেশি খেলেছি।

সাঁকো – আপনি নিজে ক্যাপ্টেন হিসেবে কাকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রাখবেন? টিমম্যান হিসেবেই বা কাদের নাম সবার আগে বলবেন?

ঋদ্ধি – ইন্ডিয়া টিমের কথা বলতে গেলে সেখানে সবাই টিম ম্যানই। দলে সবাই জানে নিজের কি কাজ আর সেখানে যদি সে ভালো করতে পারে তবেই সে টিমে থাকবে। সেই কারণে ওখানে টিমের কথাটাই আগে ভেবে সবাই খেলে। নিজেরটা করব তারপর টিমের ভালোটা দেখব, সেটা একেবারেই নয়। আর ক্যাপ্টেন বলতে আমি খেলেছি মূলত বিরাট কোহলির নেতৃত্বেই, কেননা ধোনি খেলা ছাড়ার পর খেলার সুযোগ আমি বেশি পেয়েছি।

সাঁকো – আপনি তো সারা বিশ্বের বহু স্টেডিয়ামে খেলেছেন, কোন স্টেডিয়ামে খেলে সত্যিকারের আনন্দ পেয়েছেন?

ঋদ্ধি - ইডেন গার্ডেনস তো থাকবেই, সেটা একদম নিজের জায়গা। এছাড়াও দেশে-বিদেশের আরও অনেক স্টেডিয়ামে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধে আছে। অ্যাডিলেডে খেলেছি, সেখানেও খুবই ভালো লেগেছে খেলে, মেলবোর্নে খেলিনি কিন্তু সেটাও খুব ভালো স্টেডিয়াম। সাউথ আফ্রিকার সব মাঠই খেলার জন্য খুব ভালো।

সাঁকো – এবার একটু ক্রিকেট ছেড়ে অন্য কথায় আসি। ক্রিকেটের বাইরে আপনি কিভাবে সময় কাটান?

ঋদ্ধি – ক্রিকেটের বাইরে টিমের সঙ্গে ট্র্যাভেল করার সময় আমি পরিবার সাথে না থাকলে মুভি দেখে সময় কাটাতে পছন্দ করি। কলকাতায় যদি থাকি তাহলে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সাঁকো – শিলিগুড়ির সঙ্গে কি এখনও ভালো যোগাযোগ আছে? মাঝেসাঝেই কি ওখানে যান?

ঋদ্ধি – এরমধ্যে করোনার জন্য খুব বেশি কোথাওই যাওয়া হয়নি, মা বাবা ওখানেই থাকেন, সেই কারণেই মাঝেমাঝেই ওখানে যাই। খুব বেশিদিন গিয়ে কাটাতে পারি না কেননা এদিক-ওদিক যাওয়ার প্রোগ্রাম লেগেই থাকে। যাই হয়ত প্রায়ই, কিন্তু এরকম হয় না যে গিয়ে ওখানে এক মাস কাটিয়ে আসতে পারলাম।

সাঁকো – ওখানে কি এখন বা পরে কোনো কোচিং সেন্টার বা কোনো ক্রিকেট ক্যাম্প করবার পরিকল্পনা আছে? যেখানে বাচ্চারা খেলা শিখতে আসতে পারবে?

ঋদ্ধি - অলরেডি শিলিগুড়িতে অগ্রগামী ক্রিকেট ক্লাব তো আছেই। আমি শিলিগুড়ি গেলে ফ্রি টাইম থাকলে ওখানেই চলে যাই, নিজেও প্র্যাকটিস করে নিই, ছেলেদেরও টুকটাক খেলা দেখিয়ে দিই। সেরকমই চলছে এখনও অবধি। অগ্রগামী থেকে খুবই ভালো ভালো খেলোয়াড় উঠে এসেছে। দেখা যাক এরপরে আর কি করতে পারি। কলকাতাতে থাকলেও একটা ক্যাম্পে গিয়ে আমি বাচ্চাদের খেলা দেখিয়ে দিয়ে থাকি, সেটা কালীঘাটের পি সেন মেমোরিয়াল কোচিং সেন্টার।

সাঁকো – বাংলা থেকে সবে যারা উঠতি ক্রিকেটার হিসেবে উল্লেখযোগ্য পারফর্ম করছেন, তাদের কথা কিছু বলুন।

ঋদ্ধি – অনেকের নামই করতে হয়। অভিমন্যু ঈশ্বরন অলরেডি ইন্ডিয়া টিমে ছিল, ঈশান পোরেলও মোটামুটি ভালেভাবে খেলছে। আই পি এল-এ পাঞ্জাবের হয়ে ভালো করছে। ডোমেস্টিকেও ভালো করছে রঞ্জি ট্রফিতে। এছাড়া আরেকজন অভিষেক পোরেল, সম্প্রতি আন্ডার ১৯এ উইকেটকিপার হিসাবে ব্যাকআপে ছিল। রঞ্জি ট্রফি এ বছর খেলছে। আরও কয়েকজন আছে যারা কনটিনিউ করতে পারলে অবশ্যই আরও সামনে এগোবে।

সাঁকো – এবারে আপনার পরিবার নিয়ে জানতে চাই। খেলার জন্য তো অনেকটা সময়ই বাইরে-বাইরে ঘুরতে হয়। সেটা আপনার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে কিভাবে ডিল করেন?

ঋদ্ধি – সব ফরম্যাট খেললে পরিবারকে একেবারেই সময় দেওয়া যায় না। এমনি টেস্ট ফরম্যাট খেললেও বছরে সাত-আট মাস বাইরেই থাকতে হয়। এখন করোনার জন্য আমাদের খেলা শুরুর আরো অনেক আগে চলে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে কোয়ারান্টাইন করতে হয়। সেই কারণে পরিবারকে সময় দেওয়া খুব কঠিন কাজ অবশ্যই। ফলে কিছুটা গ্যাপ পেলে চলে এসে বেশিরভাগ সময় পরিবারের সঙ্গে কাটানোরই চেষ্টা করি। এটাই এখন রিসেন্ট কয়েক বছরের রুটিন।

সাঁকো – খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে। এ বছর আপনি সদ্যই গুজরাত টাইটান্স জয়েন করেছেন আই পি এল-এ, অনেক শুভকামনা রইল আমাদের তরফ থেকে। আমাদের পত্রিকাকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ঋদ্ধি – আমারও খুব ভাল লাগলো। ধন্যবাদ।

Image Credit: Twitter

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

প্রত্যুষা

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মেঘের ভেলা

প্রশস্তি পাল

যদি মেঘ হয়ে যাই আমি,
নীল আকাশের বুকে মিষ্টি হাওয়ায় ভেসে
চলে যাব সেই অচিন দেশে-
সাতরঙা রামধনু যেথায় রং ছড়িয়ে থাকে।

জুটিয়ে অনেক সঙ্গী সাথী সারাটা দিন ধরে
খেলব সারা আকাশ জুড়ে ছুটোছুটি খেলা
করব যখন যা প্রাণে চায়,
আমরা বাঁধন ছাড়া।

সূয্যি যাবে অস্তাচলে নিশুতি রাত নামবে ধীরে
ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ছুঁইয়ে দেবে মায়াকাঠি
যখন বিশ্ব প'রে-
তখন আমি পড়ব ঝরে আবার মাটির প'রে।

ষষ্ঠ শ্রেণী
সুভাষিণী গার্লস হাই স্কুল, মালবাজার

A BRIGHT DAY

SHOMILI DEBNATH

"How perfect the weather is!
Sky so clear and blue,
With little clouds of hue;
And winds blowing in the soothing manner.
The birds chirping,
The trees moving its branches,
The swans lifting their head in pride
In the waters of the crystal tides.
The sun is smiling,
The flowers are laughing,
By seeing the Mother Nature
So happy today.
Mother Nature is happy now.
To see the Earth safe and sound,
Without dirt and pollution
And free from greenhouse gasses' notion"
This is just a dream;
To see the Earth pure and clean,
In a healthy environment.
Hope to see it soon,
waiting for it since a past blue moon.

Class VII
St. Augustines Day School, Barrackpore

অলঙ্করণঃ উৎসা দাস

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

Behind a Cloud

Prabudhaa Mitra

I stood behind a cloud,
with Sun at East,
Birds chirping all around,
I was at my knees;

It was a fluffy pillow,
I felt of a bed,
I paused there and thought,
If there was rain!!

I wished I could have slept there!
I wished I could have danced!

Suddenly my face felt a splash of water,
Mother is shouting "Awake, Morning is over"

Oh! the cloud! why into the oblivion?

Class VII
DAV School, Siliguri

অলঙ্করণঃ তিথি চক্রবর্তী

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অঙ্কন

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

উৎসা দাস
অক্সিলিয়াম কনভেন্ট
শ্রেণী - সপ্তম

SANDIPAN BANIK
Mal Adarsha Bidya Bhaban
Class - VII

SANCHITA CHAKRABORTY
Margaret S. N English School (E M)
Siliguri, Class - VII

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

SADRITO DAS
St Joseph School
Class - V

মনোজিৎ ঘোষ
অক্সিলিয়াম কনভেন্ট
শ্রেণী - সপ্তম

NIHARIKA SAHA
D.A.V, Siliguri
Class - VII

ISHANT SAHA
Jermel's Academy
Class - VII

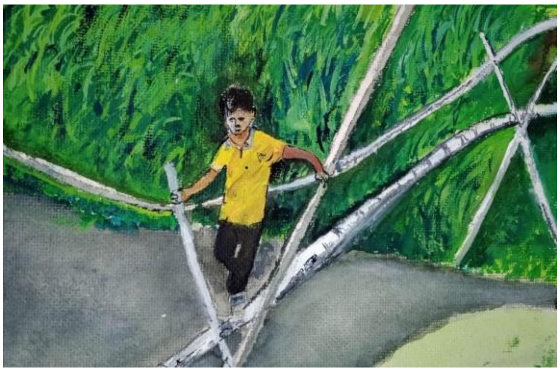

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অভ্রদীপ সাহা
অক্সিলিয়াম কনভেন্ট
শ্রেণী - ষষ্ঠ

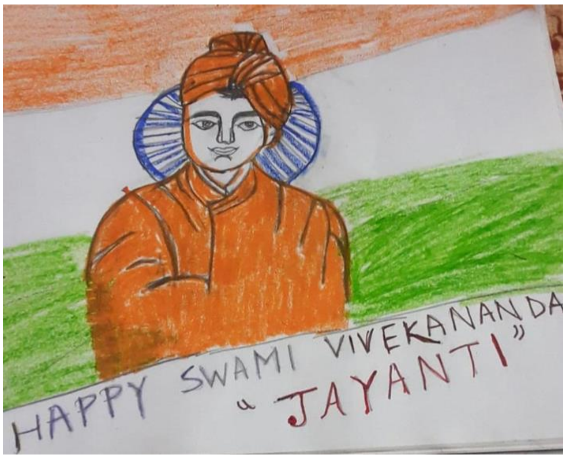

ARADHYA DUTTA
Agarpara Swami Vivekananda Academy
Class - II

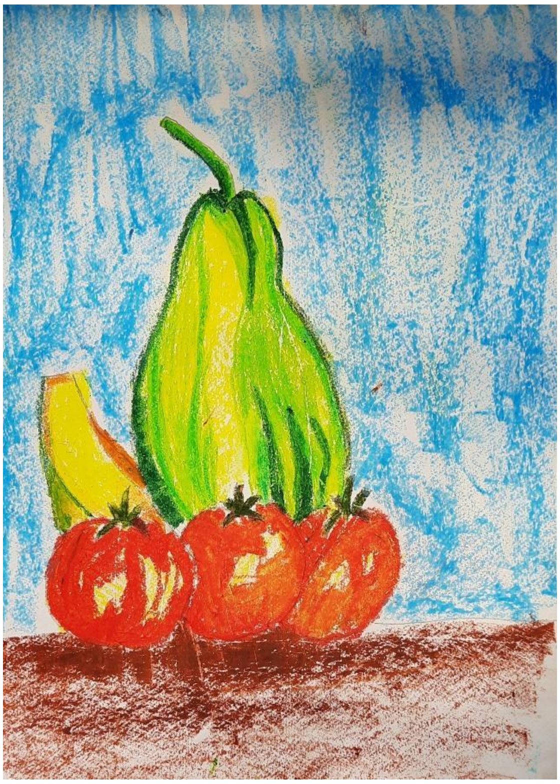

AVIRUP SARKAR
U P Public School
Class - II

APARNA TRIPATHY
St. Agnes School, Kharagpur
Class - VI

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ADVIK DASGUPTA
Ganges Valley school, Hyderabad
Class - II

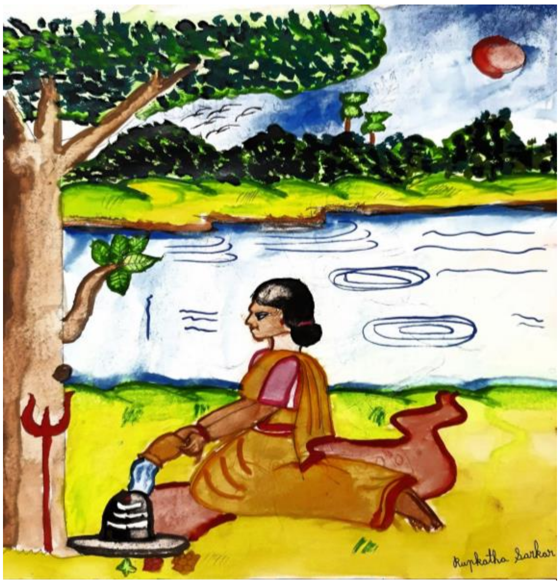

RUPKATHA SARKAR
Central Modern School, Baranagar
Class - III

RAJANNYA MAITI
Navanalanda High School
Class - VI

SRINIKA GHOSH
Gokhale Memorial Girls' School
Class - I

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

VINAYAK SAHA
South Point School
Class - V

AYISHIK BISWAS
Mahbert High School
Class - VII

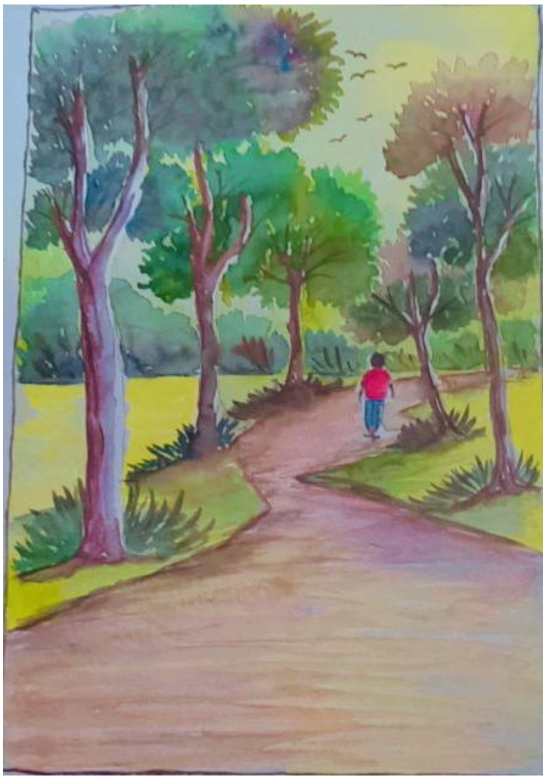

RAJONYA DAS
Subhasini Girls' High School, Mal bazar
Class - VI

SAARASWAT BISWAS
Saltlake School (English Medium)
Class - I

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

Swagata Paul
Jermels Academy, Class - X

Rajosi Ray
Jermels Academy, Class - IX

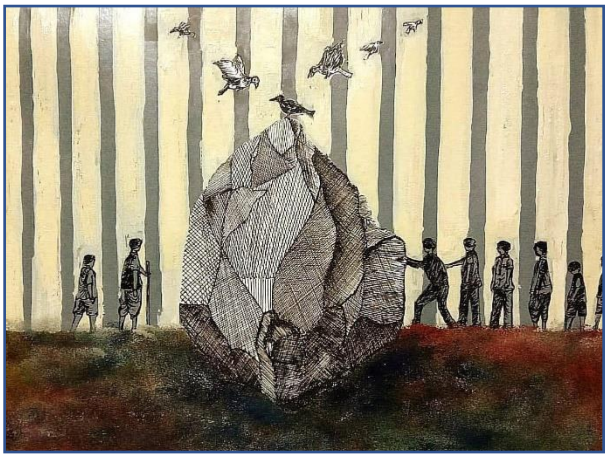

রবি রায়
SILIGURI BOYS HIGH SCHOOL

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

Debnita Paul
Tarai Tarapada Adarsha Vidyalaya,
Class - XI

সায়ন্তন মন্ডল
উচ্চ মাধ্যমিক পাস

জ্যোতি পাল
মাল আদর্শ বিদ্যা ভবন, শ্রেণী - একাদশ

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

Deepayan Paul
Tarai Tarapada Adarsha Vidyalaya,
Class - XI

Aniket Bhowmik
Ryan International
Class - VIII

Raj Dutta
Siliguri College, 3rd Year

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

Sankari Dutta Chakraborty
Siliguri

Pratyusha Das
Siliguri Govt. Polytechnic, 3rd

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

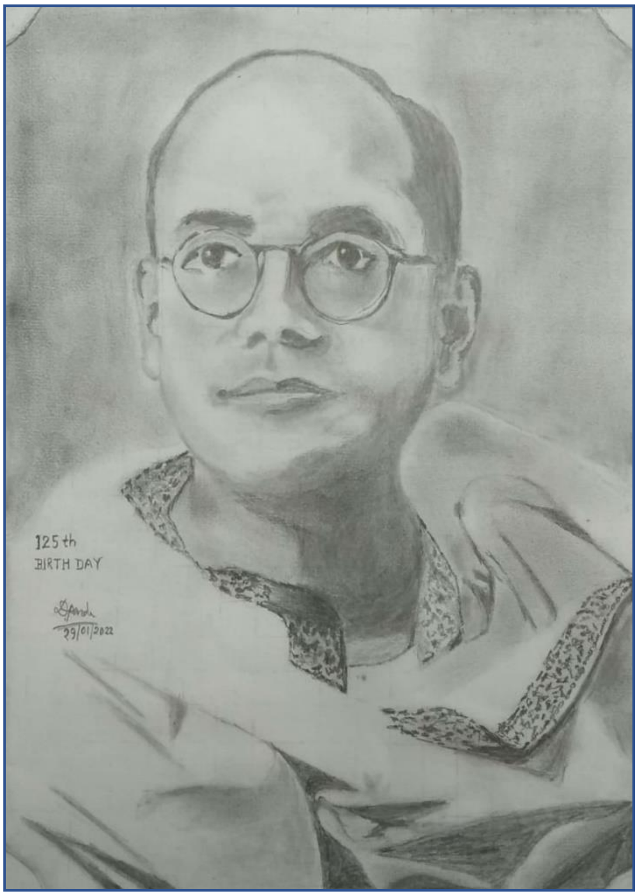

Debabrata Panda
Bashirhat

Sudeshna Bhattacharji
Kuala Lumpur, Malaysia

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অন্বেষা

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

CONTUSION

SHREYACEE MAJUMDER

The haunting mirror on the wall,
Will tell you the tale of my fall,
For he burnt my face,
Twenty years hence my forgotten case.

You see water; I feel it burn,
You fear it; I drench myself in its churn,
Acid, they call that vial,
My story is hidden in that lost file.

That scar you see on my forehead,
No, it's culprit is not the corner of the bed,
He gaslighted me, literally too,
Threw me out, because I wasn't brand new.

He labelled me 'impure', questioned my character,
Abandoned me, ruined my demeanor,
I kept persuading that it was just a friend,
But he heard nothing, brought me to a dead end.

"Don't touch me", I yell, pushing him away,
Not in the dark, but in the bright day,
My nails trying to stop him, but in vain,
He tears off, and rips my soul in pain.

And now, like a lifeless body, I lie,
Paralyzed forever until I die,
No more smiling, I'm a tainted object,
A disgrace, the society will reject.

He kept me waiting, stating his commitment fears,
And how months have turned into years,
But that day, I saw him walk down the aisle,
With that girl who's prettier, with a glittering smile.

Why didn't your fears stop you from telling a lie?
Why didn't we even have a formal goodbye?
Mental trauma is no less than physical fuss,
For physical can heal, but this never does.

But today I ask you; I'll fight,
Who gave you the right?
Over my body, over my soul?
Who are you to shatter my existence, whole?

I'll not be speechless; these words that I've never said,
Have burnt my tongue fiery dead,
The woman you worship at the temple dome,
Is the same woman you see at your own home.

2nd year
BSA Medical College, New Delhi

শিক্ষক

রেনেসা দাস

এই জগতের আঁধার ঘুচাতে
তাপিত জনের অশ্রু মুছাতে,
শিক্ষক তুমি উদয় হয়েছ আলোকরূপে।
জ্ঞানের তৃষার করি অবসান,
পাষাণের বুকে জাগিয়েছ প্রাণ।
আলোর প্রদীপ ধরেছ তুমি
এই জীবনের যাত্রাপথে।

স্বপ্ন আশায় ভরেছ হৃদয়,
হে পথ দিশারী, হে জ্যোতির্ময়।
ধ্রুবতারা তুমি ঝটিকাঘন তিমির রাতে -
জননীর মতো স্নেহের বাঁধনে,
পিতার মতো শাসন বারণে,
বেঁধেছ তুমি সন্তানদিগে, হে কৃপাময়।
শিক্ষক তুমি দিয়েছ মোদের
নবজীবনের পরিচয়।

হে শিক্ষক, হে বিশ্বজ্ঞানদাতা,
লহ শ্রদ্ধাঞ্জলী, লহ প্রণাম মম আজ।
চিরদিন তব আশীর্বচন লয়ে,
করে যাই যেন জীবনের শুভ কাজ।

দ্বাদশ শ্রেণী
শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

উন্নয়ন

নবীন পাল

বৃক্ষ তুমি দিয়েছ অনেক
ঋণ যাবে না শোধ করা,
তবু মানুষ অবুঝের মতো
কাটছে তোমার গোড়া।

তারা ভাবছে এবার বুঝি
হবে উন্নয়ন,
কিন্তু বুঝছে না তারা
তোমার প্রয়োজন।

চারিদিকে শুধু অট্টালিকা
দেখা মেলে না তোমার,
সত্যিই কি উন্নতি হবে সবার?

চারিদিক খাঁ খাঁ করে
মনে লাগে বড্ড মায়া
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের
মেলে না তোমার ছায়া।

আজ অক্সিজেনের বড় অভাব
প্রাণ-বায়ু নিয়ে টানাটানি
চারিদিকে ছড়িয়ে অসুখ বিসুখ
মহামারী, অতিমারির বাড়াবাড়ি।

এসব দেখে আড়াল থেকে তুমি মুচকি হেসে বলছ
"হয়েছে তোদের উন্নয়ন প্রকল্প?
পেয়েছিস কিছু অল্প?
শুধুই গাল-গল্প
করেছিস শুধুই অবনতির সংকল্প!"

তাইতো আমি সবারে
জানাই আহ্বান
সকলে মিলে গড়ে তুলতে হবে
সবুজের বাগান।

এভাবেই যন্ত্রণা যাবে কেটে
উন্নতি কাঁধে নিয়ে
সবুজের সান্নিধ্যে,
প্রকৃতির কোলে।

দ্বাদশ শ্রেণী
মাল আদর্শ বিদ্যাভবন

অলঙ্করণঃ প্রত্যুষা দাস

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

এক্সপ্লোর

ঋষিকা সূত্রধর

"উফ্ এই সৌম্যকে নিয়ে আর পারা যায় না, কোথাও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান নিজেই করবে অথচ শেষ মুহূর্তে এই লেট লতিফের জুড়ি মেলা ভার", বিরক্তির স্বরে বলে উঠলো রিমঝিম। "এই আবার আরেকবার ফোন করতো এই ঢিলেটাকে", একইভাবে বিষাদের সুরে বলে উঠলো নবীন। "আজ মহালয়ার সকালটাই পুরো মাটি করে দিলো এই সৌম্যটা, সকাল থেকে প্রায় দশ থেকে কুড়ি বার ওকে ফোন করেছি- তিনি এখন ব্রাশ করছেন, তখন রেডি হচ্ছেন, এই তো শুনে যাচ্ছি, বাড়ি থেকে যে কখন বেরোবেন তার কোনো খবর নেই", বললো শুভ। হঠাৎ হৈ হৈ করতে করতে নিখিল স্যারের বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হ'ল সৌম্য, "আরেহ্ আরেহ্ এসে পড়েছি এসে পড়েছি, তোরা থাম বাবা উফফ্। একটু শ্বাস নিতে দে আমায়-" বলেই এক প্রাণ শ্বাসবায়ু বুকে নিয়ে সৌম্য বললো, "আহঃ কী সুন্দর সকাল, মহালয়াটা পুরো জমে যাচ্ছে কি বলিস রিমঝিম।" রিমঝিম যেন সৌম্যর এরম কিছু একটা আচরণের জন্যই অপেক্ষায় ছিল। সৌম্যর কথা শুনেই তড়াক করে সৌম্যর উদ্দেশ্যে কটূক্তি করে বললো, "আচ্ছা আমাদের কাল রাতে কি ঠিক হয়েছিল যেন? আজ আমরা ভোর পাঁচটায় আমাদের ঠেকের সামনে এসে উপস্থিত হবো তারপর কোথাও একটু হেঁটেই ঘুরে আসবো। কিন্তু তুই, এই তোর জন্য বলে কতো দেরি হয়ে গেল বলতো। কোথায় ভোর পাঁচটা আর কোথায় এখন ছ'টা বেজে গেছে, সে খেয়াল আছে তোর? অবশ্য সারা রাত নিজে না ঘুমিয়ে ফেসবুক করলে তো এমনটাই আবশ্যক।" খুনসুটির এই বন্ধুত্বের কটু কথা কখনোই সৌম্য বা রিমঝিমের বন্ধুত্বের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এসব ওদের সয়ে গেছে এখন তাই বেশ মজার ছলেই সৌম্য বললো, "আচ্ছা আচ্ছা বাবা আমার ভুল, এই কান ধরলাম বাপু, এবার চল মা, সবাই চল, এরপর নাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে কিন্তু বলে দিলাম।" নবীন এর মধ্যেই সবাইকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে তারা যেন ঠিক সময় মতো তাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য পাড়ার মোড়ের মাথায় চলে আসে। এবার সে বললো, "আচ্ছা বললাম যে সবাই তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু এখনও আমাদের গন্তব্য তো স্থির হ'ল না! কোথায় যাবো সেটাই ঠিক হ'ল না" সৌম্য বললো, "আরেহ্ বাবা চল-না হাঁটতে হাঁটতে কোনো কিছু ভেবে নেবো, আপাতত রেলস্টেশন অবধি যাওয়া যাক তারপর না হয় কোনো নতুন একটা জায়গা আবিষ্কার করা যাবে।" শেষের কথাগুলো বেশ প্রলুব্ধ স্বরেই বললো সে। শেষমেষ নানান যুক্তি-তর্কের শেষে তারা রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

যেতে যেতে অনেক কথা হ'ল তাদের মধ্যে, উজ্জ্বলও তাদের সাথে যোগ দিলো। সামনেই টেস্ট এক্সাম তারপর উচ্চমাধ্যমিক। আর কিছুদিন তারা একসাথে, তারপর কে কোথায় যাবে তার কোনো ঠিক নেই। এসব ভাবলেই মনটা বিষণ্ণ হয় তাদের। সেই ছোটবেলা থেকে তারা একসাথে, আর আজ হঠাৎ করে এভাবে বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে দূরে চলে যাবে সবাই! এটা মেনে নেওয়া খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এইসব আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে আর ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে করতে তারা মাল জংশনে পৌঁছালো। রাস্তায় যদিও অনেকবারই সবাই বলেছে যে আর হয়তো হাঁটতে পারবে না কিন্তু তবুও ওই যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পৃথিবীর অন্যতম সেরা সম্পর্ক যার দরুন তারা জীবনে প্রথমবার এতটা হেঁটে আসতে পারলো। সকাল সাতটা নাগাদ ফোনটা দেখে নবীন বললো, "নারে এবার ফিরতে হবে সাতটা বাজে, এরপর দেরি হয়ে যাবে।" হঠাৎ একটা নেতা-নেতা ভাব করে সৌম্য প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠলো, "নো নো নো! নেভার! এখন নয় এখন নয়। এই তো সবে শুরু বন্ধু, এরপর কতো তো পথ চলা বাকি আমাদের।" নবীন জিজ্ঞাসু-পিপাসু সুরে বলল, "শুরু? শুরু কি রে? এই তো

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মালবাজার শেষও হয়ে গেলো! এরপর কি তোর হাঁটাপথে শিলিগুড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি!" সৌম্য জানালো, "হ্যাঁ! মানে ইয়ে মানে না, আসলে ফিরবো বৈকি।" "হ্যাঁ তো তাহলে চল ফেরা যাক-", বললো রিমঝিম আর উজ্জ্বল, বলেই ওরা তিনজন মিলে ৩১নং জাতীয় সড়ক দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে কি তখনই সৌম্য ফের তাদের সেই কাজেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। "আরে বাবা দাঁড়া দাঁড়া! ওদিক দিয়ে নয় এইদিক দিয়ে!" বলেই ডান হাতের অনামিকাটা রাস্তার ডানদিকে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়া একটা সুঁড়ি পথের দিকে দেখিয়ে দিলো। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দেখানো দিকে তাকালো। অনেক তর্কাতর্কির পর আমরা সবাই সেই সুঁড়ি পথ দিয়েই বাগানের ভেতরে প্রবেশ করলাম। রাস্তা যেহেতু একেবারেই অচেনা তাই সবাই সোজা পথেই যেতে থাকলো। সবুজ চা বাগানের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে নানান অপূর্ব দৃশ্য তাদের চোখে পড়তে লাগলো আর রিমঝিম সাথে সাথেই সবটা তার ফোনে ভিডিও বা ছবি করে রাখছিল। অনেকখানি পথ আগেই হাঁটা হয়ে গিয়েছিল বলে সবাই একে একে ক্লান্ত হতে শুরু করলো। সোজা পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা ছোট-খাটো গ্রাম মতো দেখা গেল। রাস্তাটা শেষ হচ্ছে না দেখে রিমঝিম, নবীন অনেকক্ষণ থেকেই গুগল ম্যাপ থেকে মালবাজার যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল। কিন্তু এখানে বলা বাহুল্য যে গুগল এখানকার রাস্তার সন্ধান দিতে পুরোপুরিই ব্যাহত হয়েছিল। তাই নিরাশ হয়েই তারা গ্রামের পথ ধরে একটা বটতলার নিচে বসার জায়গাটায় একটু আরাম করে নিল। তাদের কাছ থেকে জানতে পারলো যে বটতলার পাশ দিয়ে বাঁদিক দিয়ে গেলে তারা অতিদ্রুত তাদের গন্তব্যে পৌঁছবে। তারা সেই কথা মতো বাঁদিক দিয়ে যেতে লাগলো। প্রায় দেড় ঘণ্টা হাঁটার পরেও তারা রাস্তা খুঁজে পেলো না বরং যত বার কোনো রাস্তা দিয়ে গেছে ততবারই একই জায়গায় এসে পৌঁছল তারা। এবারে সবার একটু ভয় হতে লাগলো। একেই বাগানের রাস্তায় কোনো লোকজন দেখতে পাওয়া যায় না তার ওপর ঘন চা বাগানের মাঝে তারা রাস্তা হারিয়ে বসে আছে। এদিকে বেলাও অনেক হতে চললো। নেটওয়ার্কও নেই যে কাউকে ফোন করে রাস্তা জিজ্ঞেস করবে। হতাশ হয়ে তারা বসে রইলো। এরপর মিনিট দশেক বাদে কাঁচা রাস্তার সেই চৌহদ্দি থেকে চারজন চারদিকে রওনা হ'ল। আর তারা যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তার ওপর দাগ কেটে চলতে লাগলো যাতে ফেরার সময় অসুবিধে না হয়। প্রায় আধঘন্টা পরে সবাই আবার ঘুরে ফিরে আগের জায়গায় এল। শুধু একজন বাদে ! রিমঝিম! নবীন প্রায় চিৎকার করেই বললো, "রিমঝিম, রিমঝিম গেলো কোথায়?" তারা চার নম্বর রাস্তাটার দিকে তাকালো আর জোরে জোরে প্রাণপণে ডাকতে লাগলো, "রিমঝিম এই রিমঝিম! কোথায় তুই? শুনতে পাচ্ছিস আমাদের আওয়াজ?" কোনো আওয়াজ এলো না। এবার ভয় হতে থাকলো তিনজনের। এভাবেই আরো মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। সৌম্য বলে উঠলো, "এভাবে বসে থাকলে আর কিছুই হবে না। আমাদের যাওয়া উচিত এই রাস্তায়।" উজ্জ্বলও সৌম্যর কথায় সম্মতি দিলো আর বললো, "সৌম্য ঠিকই বলেছিস, বসে থেকে কোনো লাভ নেই। রিমঝিম যদি রাস্তা পেয়েও থাকতো তাহলে ও আবার এসে আমাদেরও ওর সাথে নিয়ে যেত। ও যখন আসেনি তার মানে নয়তো খারাপ কিছু হয়েছে আর নয়তো ও হারিয়ে গেছে।" "এখানে তো অনেক জন্তু জানোয়ারও আসতেই থাকে প্রায় সময়। চিতা বাঘ বা তার ছোট বাচ্চা, বুনো হাতি এমনকি আজকাল ভাল্লুকও আসছে।" বললো নবীন। সেরকম কিছু হলে তো গ্রামের লোক সজাগ করার জন্য এতক্ষণে অনেক চেঁচামেচি করতো, সেসব যখন কিছুই করেনি তার মানে এসবের ভয় পেয়ে লাভ নেই, চ চ যাওয়া যাক" সৌম্য এই বলে রাস্তার দিকে যেতে লাগলো।

এখানে বলে রাখা ভালো যে এই রাস্তাটা অন্যান্য রাস্তার থেকে একটু আলাদা। অন্যগুলো বেশ চওড়া ছিল কিন্তু এই রাস্তাটা একেবারেই ভাঙ্গা, কাঁচা আর অনেক সরু। পাশাপাশি দু'জন করে হাঁটতেও একটু অসুবিধে হয়। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পরে রাস্তাটা একটা বাঁশঝাড়ে এসে শেষ হ'ল। বাঁশঝাড় ছাড়া আর কিছু নেই কোনো দিকে। রাস্তা বন্ধ। "তাহলে রিমঝিম গেল কোথায়!" সৌম্য বললো। অবাক হয়ে সবাই একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। ভয়ে দুঃখে ক্ষোভে সবার চোখ জ্বল জ্বল করতে লাগলো। হতাশ হয়ে পিছনে

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ফিরতেই হঠাৎ ডানদিকের একটা ঝোপের আড়ালে কী যেন দেখতে পেলো উজ্জ্বল। "এটা, এটা তো রিমঝিমের স্কার্ফ, না?" বললো সে। সবাই গিয়ে দেখলো যে সত্যি এটা রিমঝিমের সেই নীল স্কার্ফটা। এরপর ওরা সেই ঝোপ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করলো। ঝোপটা পেরিয়েই দেখলো খালি একটা জায়গা। বাঁদিকে বাঁশঝাড় আর তার কিছু পিছনেই একটা পোড়ো বাংলো মতন। হয়তো বাগানের সাহেবরা একসময় এখানে থাকতো। বাড়িটার থেকে ডান দিকে তাকালে দূরে রেললাইন দেখা যায়। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনজনই পোড়ো বাংলোটার দিকে এগিয়ে গেল। বাংলোটা আর পাঁচটা সাধারণ বাংলোর মতোই শুধু তফাৎ এই যে বাড়িটা দেখেই কেমন একটা ভূতুড়ে ভূতুড়ে অনুভূতির সঞ্চার হয়। সামনের জং ধরা ফটক পেরিয়ে সকলে বাগানের নোংরা আগাছা মাড়িয়ে ইঁট বাঁধানো রাস্তা দিয়ে বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনটে সিঁড়ি পেরিয়ে লম্বা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো বিশাল প্রহরীরূপী দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা। তাহলে কী এখানে রিমঝিম আসেনি! নাকি নিজেই ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছে দরজাটা। এসব ভাবতে ভাবতে তিনজনই দরজার পাশের জানলাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। ভেতরে এতটাই অন্ধকার যে এখন দিন নাকি রাত সেটাই বোঝা যায় না। অনেক সাহস যুগিয়ে অন্ধকারেই তিনজন হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলো। হঠাৎ নবীনের মনে হ'ল যেন তার পায়ের কাছে কিছু পড়ে আছে। বুঝতে পেরেই, "কে! কে পড়ে আছে নিচে?" বললো নবীন। চট করেই উজ্জ্বলের মনে এল যে তাদের মোবাইল ফোনটা তো তাদের সাথেই আছে, সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বালাতেই তারা অবাক হয়ে গেল। রিমঝিম! সে নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে! না জানি কতক্ষণ ধরে পড়ে আছে বেচারি এভাবে। রিমঝিমের মাথাটা তুলে ওকে ডাকতে লাগলো সবাই মিলে। কিন্তু রিমঝিম নিঃসাড়। জল খুঁজতে লাগলো তারা। কিন্তু সে গুড়ে বালি। জল পাওয়া গেল না। কি করবে এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তারা রিমঝিমকে কোনোমতে দাঁড় করিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে বেরোবে বলে পেছনে ফিরতেই, সর্বনাশ! জানলা নেই! তার বদলে জানলার উল্টোদিকের দেওয়ালটা! হায় ঈশ্বর! এবার কী করবে ওরা। ভীষণভাবে ভয় পেয়ে যায় তারা। কানের পাশ দিয়ে ঠান্ডা হিমশীতল একটা স্রোত বেয়ে যায়। ফ্ল্যাশ লাইটটা চারিদিকে ঘোরাতে থাকে সৌম্য। হঠাৎ "আ আ আ-" ভয়ার্ত একটা আর্তনাদ। সৌম্য, সৌম্য চিৎকারটা করলো। ফ্ল্যাশ দিয়ে ঘরটা দেখতে গিয়ে আচমকা কী যেন একটা তার সামনে এসে পড়েছে। ফের সবাই একসাথে সেদিকে তাকাতেই ফাঁকা। কিছু নেই সামনে। "আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে। জায়গাটা, জায়গাটা ঠিক নেই একদমই।" বললো নবীন। এই বলে রিমঝিমকে নিয়ে তারা দরজার দিকে এগোতে লাগলো। সৌম্য দরজার হাতল ধরে টানতেই সেটা বদলে একটা দেয়াল আলমারিতে পরিণত হ'ল! কী সর্বনাশ, তারা যেদিক থেকেই বেরোতে চাইছে সেইদিকই বদলে যাচ্ছে কোনো-না-কোনো কিছুর সাথে। ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগলো তারা। হঠাৎ একটা আওয়াজ তাদের কানে এলো। আওয়াজটার দিক বোঝা যাচ্ছে না। অস্পষ্ট কিছু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা, মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। তারা সবাই এতক্ষণ বাংলোটার বৈঠকে ছিল, বৈঠকের পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি চলে গেছে ওপরের দোতলায়। সিঁড়ির পাশে একটা অন্ধকার ঘর। তাদের মনে হ'ল আওয়াজটা সেইদিক থেকেই আসছে- এইভেবে সেদিকে একসাথে তাকালো তারা। হঠাৎ আওয়াজটা আরো জোরে শোনাতে লাগলো। এখন আওয়াজটা বেশ ভালোই শোনা যাচ্ছে। এখন আরো পরিষ্কার, আরো তীক্ষ্ণ। সৌম্য দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, দরজার একেবারে সামনে এসে হাতল ধরে খুলতেই একটা বাজে মরা-পচা দুর্গন্ধ তার নাকে এলো। কী বিকট সেই দুর্গন্ধ! সেই দুর্গন্ধে সৌম্যর পেট গুলিয়ে এলো। আর এক মিনিটও যদি সেখানে সে থাকতো তাহলে সে হয়তো তখনই অজ্ঞান হয়ে যেত। হঠাৎ এক রাশি চামচিকে এসে পুরো বৈঠক ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আর সৌম্য, "পালা!" বলে দরজার দিকে এগোতে উদ্যত হ'ল। তারপর তিনজন মিলে রিমঝিমকে নিয়ে কোনোভাবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। হাঁফাতে লাগলো তারা। কিছুক্ষণ বসে তারা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল আচমকা একটা বুড়ো হাতে লাঠি নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকতে লাগলো। চার বন্ধুকে বাংলো থেকে বেরোতে দেখে

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

তিনি যেন ভূত দেখার মতন অবাক হলেন। তারা কিভাবে এই বাড়িতে এলো সেই বুড়ো জিজ্ঞেস করায় নবীন সবটা তাকে বোঝালো। তিনি রিমঝিমের জ্ঞান ফেরানোর জন্য তাদের সবাইকে আউট হাউসে আহ্বান জানালে সবাই তার পেছন পেছন আউট হাউসে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে বুড়োর খাটিয়ার ওপর রিমঝিমকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। বুড়ো বললো সে এই বাংলো দীর্ঘ আট বছর ধরে দেখাশোনা করছে, সকালে সাতটা নাগাদ সে আসে এরপর বাজার করার জন্য শহরে ফিরে যায় আর বারোটার মধ্যে আবার ফিরে আসে। সারাদিন রান্নাবান্না আর এদিক ওদিক দেখাশোনা করতে করতে কেটে যায় তারপর বিকেল পাঁচটার মধ্যেই সে আবার বাড়ি ফিরে যায়। রাতে নাকি এই বাড়িতে কেউ থাকতে পারে না। এমনকি অনেক কথাও নাকি প্রচলিত আছে এই বাড়ি সম্পর্কে। অনেকেই বলে এখানে নাকি রাতে অনেক চিৎকার, আর্তনাদ শোনা যায়। বাগানের লোকেরা একে ভূত-বাংলো আখ্যা দিয়েছে। এরপর তার চোখে মুখে জল দিয়ে একটু ডাকাডাকি করার পরই কিছুক্ষণ বাদে রিমঝিম চোখ খুললো। রিমঝিম চোখ খুলতেই সবারই সমগ্র শরীর বেয়ে একটা রক্ত-হিম করা ঢেউ খেলে গেল। কি অবিশ্বাস্য! রিমঝিমের চোখে কোনো মণি নেই, বরং পুরো সাদা রঙের চোখটা খুলে সে তাকিয়ে আছে ওপরে। এবার তড়াক করে সে প্রায় উড়ে গিয়েই দরজার ওপর ঠিক যেন একটা টিকটিকির মতন সেঁটে রইল। "আ আআ-" রিমঝিমকে দেখে সৌম্য ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। এখন রিমঝিমের শরীরের সামনের দিকটা দরজার সাথে, অথচ মুখটা পেছনে! হাড়হিম হয়ে গেল সবার। নবীন একটা চিৎকার করতে চাইলেও যেন কী একটা অজানা কারণে তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে পারলো না। কেয়ারটেকার বুড়োটাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন এখন কি তখন মরতে বসবে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে সবাই প্রায় জ্ঞান হারাতে বসলো। বুড়ো কোনো রকমে একটু সম্বিত ফিরে পেতে খাটিয়ার পাশের দেরাজ থেকে একটা গোল মুদ্রা মতন লকেট বের করে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগলো আর রিমঝিমের দিকে এগোতে লাগলো। এরপর রিমঝিম প্রবল গর্জন শুরু করলো। আর তার শরীর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে মাটিতে এলিয়ে পড়লো। কী ভয়াবহ সেই দৃশ্য! রিমঝিম ছটফট করতে লাগলো মেঝেতে। তারপর, তারপর সে জ্ঞান হারালো আবার। তার সামনে যেতে সবাই ভয় পাচ্ছিল খুবই। বুড়ো বললো, "এখন আর ভয় নেই, ও ঠিক আছে এখন। তোমরা ওকে খাটিয়ার ওপর শুইয়ে দাও।" কিছুটা সাহস মনে নিয়ে সবাই তাকে খাটিয়ার ওপর শুইয়ে দিল। তারপর সবাই মিলে বাইরে গেলো।

"আচ্ছা, আপনি এরকমটা কখনো হতে দেখেছেন? না- মানে আপনি তো আট বছর ধরে এই বাড়িতে আছেন। আগেও কি কারোর সাথে এমনটা হয়েছিল?" বললো উজ্জ্বল। বুড়ো বললো, "দেখিনি! তবে জানতাম একদিন না একদিন এমনটা হতে পারে।" নবীন বললো, "মানে? এমনটা হবে আপনি জানতেন? কিন্তু কিভাবে?" বুড়ো বললো, "বলছি বলছি, সব বলছি। বছর কুড়ি আগে এখানে এক খ্রিস্টান বাবু থাকতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। আর তিনি তার সাথে একজন অতি সুন্দরী মহিলা, মানে তার প্রেমিকাকে এনেছিলেন। দু'জনে বেশ ছিলেন। প্রেমিক সারা দিন বাগানের অফিসে কাজে ব্যস্ত থাকতেন আর শহুরে মেম বাড়ি গোছাতে, বাগান করতে আর বাগানের মানুষদের সাথে আলাপে মত্ত থাকতেন। বাগানের মানুষও তাদের দু'জনের অবিবাহিত সম্পর্কটাকে মেনে নিয়েছিল। একদিন হঠাৎ মেমের শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়, তাকে শহরে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। বারবার বমি করার দরুন তার শরীর একেবারে বিছানার সাথে মিশে গিয়েছিল। বাবুও কাজের জন্য শহরে হাসপাতালে থাকতে পারতেন না। একজন পরিচারিকা তার খেয়াল রাখার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। কোনো প্রয়োজন হলে তিনিই বাবুকে জানাতেন। একদিন পরে হাসপাতাল থেকে ফোন আসে বাংলোর টেলিফোনে। ডাক্তারবাবু জানান যে মেম মা হতে চলেছেন। বাবু কখনোই বিয়ে বা বাচ্চাকাচ্চা এসবে বিশ্বাস করতেন না। আর মেম ছিলেন ঠিক তার উল্টো। তিনি মা হবেন জানতে পেরে খুব খুশী হন আর বাবুকে তাড়াতাড়ি শহরে যাওয়ার জন্য আবেদন জানান। বাবু শহরে যান। দু'দিন বাদে তারা দু'জনই ফিরে আসেন। বাড়ির চাকর, সেই পরিচারিকা সবাই আনন্দের সাথে তাদের আগমনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই বাবু নিজের রং

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

পাল্টে ফেললেন। যা তা করে মেমকে গালাগালি করলেন। এমনকি তাদের সামনে যে বাড়ির চাকররা আছে সেটাও তিনি ভুলে যান। এমনকি গায়ে হাতও তোলেন তিনি মেমের। মেমসাহেব খুব কষ্ট পান। কান্নায় ফেটে পড়েন তিনি। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে পুলে স্বামী নিয়ে সংসার করবেন, কিন্তু তার প্রেমিক সেসব কিছুই হতে দিলেন না। বরং তাকে বাচ্চাটা মেরে ফেলার কথা বললেন। মেম রাজি হন না। সেদিন রাতে খুব ঝগড়া হয় তাদের। বেডরুম থেকে চিৎকার ভর্ৎসনার আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে সাহেব খুব জোরে একটা চিৎকার করলেন, তারপর সব চুপ। চিৎকার শুনে দৌড়ে ওপরে দোতলায় পৌঁছায় খ্রিস্টান চাকর জোহান। তারপর আবার একটা চিৎকার। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর সাহেব খুব তাড়াহুড়োয় নিজের ড্রেসিং গাউন পড়েই বিবর্ণ মুখে বাড়ি থেকে নিজের কালো এম্বাসেডর গাড়িটা নিয়ে চলে যান। পরদিন সকালে মেমের পরিচারিকা যখন ব্রেকফাস্ট দেওয়ার জন্য মেমসাহেবের ঘরে যান তখন সে দেখে যে ঘরটা বাইরে থেকেই ছিটকিনি দেওয়া। ছিটকিনি খুলে সে দোতলায় মেমসাহেবের ঘরে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণের জন্য পুরোই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে সে। হাতের খাবারের ট্রে-টা পড়ে যায় ধপ করে মাটিতে। বিছানার ওপর শুয়ে আছেন মেমসাহেব আর মেঝেতে পড়ে আছে জোহান। পুরো বিছানা আর মেঝে রক্তে ভেজা। পেটে বার তিনেক চাকু বা সেরকম কিছু আঘাতের দাগ রয়েছে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে পরিচারিকা। এরপর একে একে বাড়ির আশেপাশে থেকে আরো কয়েকজন এসে উপস্থিত হন। পুলিশ এসে সাহেববাবুর খোঁজ নেয় তারপর অনেক চেষ্টা করেও বাবু আর কখনোই ফিরে আসেননি। মেমসাহেবের এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির পর থেকেই এই বাড়িতে নানা ভৌতিক ঘটনা ঘটতে শুরু করে। সারা বাড়ি জুড়ে মেমসাহেবের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় বাংলো জুড়ে। যদিও রিমঝিমের মতো কাউকে আমি আজ অবধি দেখিনি কিন্তু জানতাম এরমটা হবেই।" এই বলে বুড়ো নিজের কথা শেষ করলেন। "আচ্ছা আপনি তো বললেন যে আপনি এখানে আট বছর আগেই এসেছেন, তাহলে এইসব এতো ইতিহাস আপনি জানলেন কোথা থেকে?" বললো নবীন। "আহা উনি তো আগেই বললেন যে লোকমুখে অনেক কথাই প্রচলিত আছে, উনি হয়তো সেখান থেকেই জেনেছেন" বললো সৌম্য। "কিন্তু তাহলে তিনি-" থেমে গেল নবীন। কারণ ইতিমধ্যেই রিমঝিম এসে বসেছে কখন যেন। এখন ঠিক আছে রিমঝিম। শুধু মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে তার, বাড়ি ফিরতে চায় সে।" আপনিও তো খ্রিস্টান। এই বাড়ির চাকরই বলা যায় আপনাকে। আপনার সত্যি পরিচয়টা কি বলুন তো? আপনি যখন মন্ত্র বলছিলেন ওই লকেটটায় আমি দেখেছি পেছনে জোহান খোদাই করা ছিল। আপনি সত্যিটা আর লুকোবেন না প্লিজ" বললো নবীন। এক বিকট হাসিতে ছেয়ে গেল চারিদিক। "জেনেই যখন গেলে তখন আর লুকোনো ঠিক হবে না, তুমি যা আশা করেছো সেটাই ঠিক।" বললো সেই বুড়ো। উঠে দাঁড়ালো সবাই একে একে।" তার মানে আপনি, আপনি!" বললো সৌম্য। "আমি তো ঠিক কিছুই বুঝছি না" রিমঝিম বললো। "হ্যাঁ আমিই"। এবার প্রবল অট্টহাসিতে চারিদিক ফেটে পড়লো। সবাই এক দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। কোনোমতে সবাই মিলে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রামে প্রবেশ করলো। রাস্তায় রিমঝিমকে তারা সবটা বললো। তার অজ্ঞান হওয়া, বাকিসব ভূতুড়ে কীর্তিকলাপ সবটা। এরপর তারা মালবাজারের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছালো। এবার ফেরার পালা।

দ্বাদশ শ্রেণী
সুভাষিণী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়, মালবাজার

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

CRIME AND FAIR SEX- MARIE SUKLOFF, BONNIE PARKER AND PHOOLAN DEVI

RITAJA DUTTA GUPTA

Protagonist and antagonist- the two-opposing force of a story line. Most of the characters in every story are either classified under the protagonist or the 'good person' or antagonist also synonymous to the 'bad person'. But in this world of literature as we get introduced to various antagonists and protagonists, do we somewhere find a male domination under the antagonist category? Characters like Harley Quinn do stand as an odd one out but at the end of the day does this reflect our ideology of relating men with things like crime and murder? This might be a debatable topic but in the history of crime, we get to see many criminals who were the terror, the hero, the sweetheart and above all, women. And it would be wrong not to mention the three personalities from different eras - Marie Sukloff, Bonnie Parker and Phoolan Devi, while we discuss about crime and fair sex.

Let us rewind back to the 1930's. The breaking point of the United States. With the crash of stock market in America, millions lost their life savings and unemployment was at its peak. This decade was also named as the 'Decade of Legendary Gangsters' and witnessed two legendary outlaws Bonnie and Clyde. The 'Robin Hood' figures of South America robbed banks, committed murders and left a chaos behind them while the stolen money was distributed to the poor farmers like many others of that time. But Bonnie Parker was different from all the other gangsters. Her life contradicted the general lifestyle of women who were expected to cook, clean and take care of children as their only responsibility during that time. Ironically, she herself struggled and was obsessed in keeping up 'the ladylike' image of herself. She was a glamorous danger in high heels, a love sick lady and a hero to the poor and broken people. With her boyfriend Clyde by her side, they went through their dangerous journey escaping the police and being the most wanted criminals until 23rd May 1934. Clyde Barrow and Bonnie Parker were killed on a rural road in Bienville Parish. This did mark the end of their life but Bonnie and Clyde are still remembered through various movies and music. Bonnie always wished to be famous. She loved keeping cut outs and photographs of newspapers which printed their deeds on ink. This did fulfill her wish and both enjoyed this fame as they left their names in the history of legendary gangsters.

Moving forward to our next personality, we get to see a portrait of an assassin. A young Russian woman who swore that she would do anything that would cause the fall of Tsarist government. Her revolutionary activities were conducted secretly and thus there are no official records of her life except her autobiography 'Life of a Russian Exile'. In September 1885, Marie Sukloff was born in a family of Jewish peasants living in the town of bar. She saw the struggle of peasants to make the ends meet. At the age of 12 she dutifully took her place in supporting revolutionary ideologies which were considered illegal that time. She even learned to read from political bulletins. Her parents were horrified once they found out. They felt these ideas made no sense. But Marie wanted to prove them wrong. She was convinced that revolution was the solution to all their pain and poverty. Time passed making the 12-year-old girl from a part of a revolutionary group to a member of Socialist revolutionist movement at the age of 17. She was arrested for possessing components of a printing press

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

and was imprisoned near Odessa, Russia. On Easter Sunday 1903 she heard the sound of a massacre outside her prison. History remembers this day as the Bloody Sunday incident. And this incident left her deeply shaken. Shortly after she was deprived of all rights and sent to Siberia from where she soon escaped. In 1914 she joined another organization. At present we might be calling it 'a terrorist organization'. And this organization brought her fame as an assassin. She assassinated Russian Governor General Fyodor Dubasov governor who was notorious for carrying out pogroms on local Jewish families. She was imprisoned again but she escaped for the second time. And much after she disappeared from all historical records and information about her death left unknown to the world bringing a mysterious end to the story of the assassin.

Both Bonnie Parker and Marie Sukloff were superhero figures to a certain group of people. Yet at the end of the day their identities mainly had the terms- criminal, robber and assassin. But Phoolan Devi or the Bandit queen of India differed from them despite having criminal records too. She was also known for being an Indian female rights activist, politician and later a Member of Parliament. Born in a poor household, she faced discrimination for belonging to a lower class. Her life story highlights the sufferings of a poor, lower class girl in the Indian society. The injustice she faced in her life was what she considered to be a 'turning point'. These made her the Bandit Queen. Committing 30 kidnappings and murdering 22 higher caste men which we remember as the 1981 Saint Valentine's Day Massacre, she made her place on India's top ten most wanted list. But as the whole set of incidents came in front, she was considered more a hero than a villain or a threat to the nation. She was a cast hero. And as most of her Hindu supporters considered her to be the vengeful hand of the warrior goddess Durga. In 1991 human rights activist and writer Mala who visited Phoolan Devi during her 11 years of imprisonment published her biography called India's Bandit Queen. Phoolan Devi was assassinated on 25th July 2001. But she left behind her struggles and morals of standing up for oneself and protesting against injustice.

Maybe after all in the literature world we don't get to see many famous, breathtaking and feared female antagonists. But the real world is completely different. Human beings are composed of qualities that fall under both good and bad categories. And for this reason, it would be very wrong to consider female with soft, good and kind nature only. For history clearly recognize feminine brutality. Not only Bonnie Parker, Marie Sukloff or Phoolan Devi but there are numerous case records to prove it. Also, these real life 'antagonists' left behind certain morals to admire. Be it Bonnie's generosity for the poor and needy, Marie's willingness to kill or even die for her people or Phoolan's bravery to return as a local hero for her people. This is Women in the crime world.

Class 10,
South Point High School, Kolkata

অলঙ্করণঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মগজাস্ত্র

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

শব্দছক

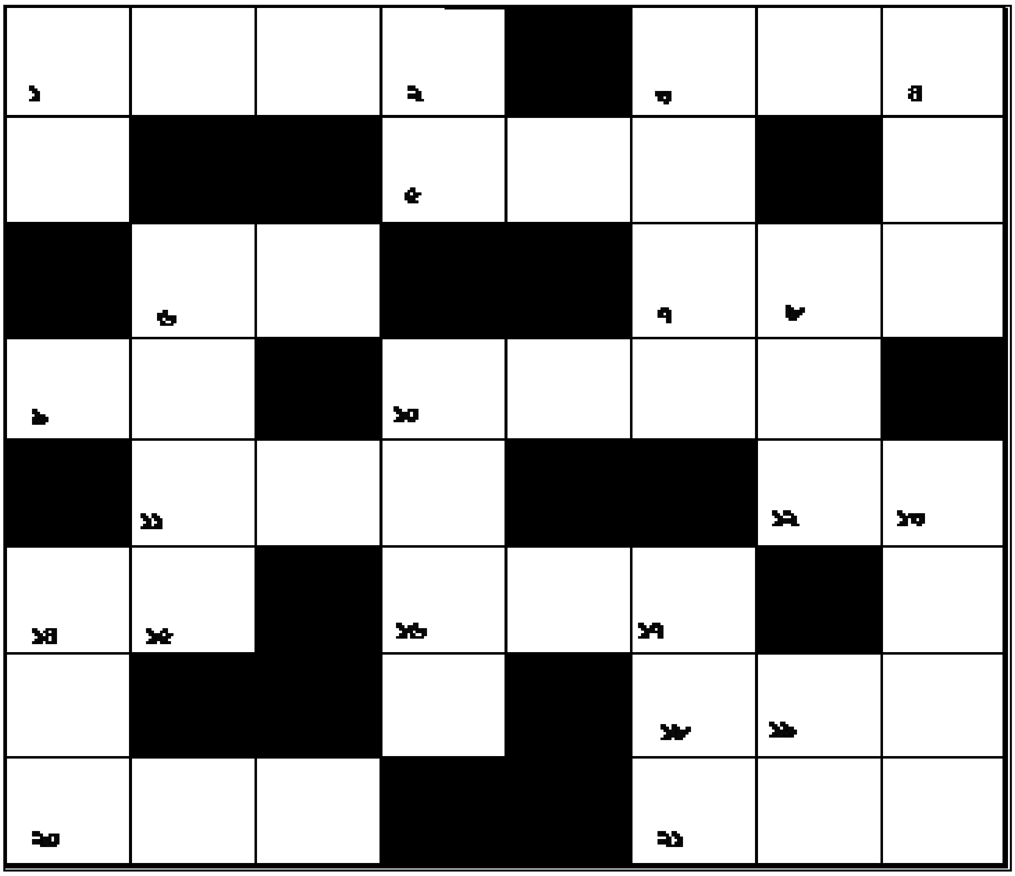

পাশাপাশিঃ

১. হোরিখেলার আসল জায়গা, ননীচোরার বাল্যভূমি
৩. প্রানপণ
৫. যে বদনে রসের অভাব
৬. সবাই একেই খুঁজি, কিন্তু আসলে অস্তিত্ব আছে কি?
৭. দেখতে ভালো, তবু এই ফলের নাম নিলে গালিই হয়
৯. যে সংখ্যা হাতে থাকলে সহজেই কাজ সারা যায়
১০. জঙ্গলে শুকনো কাঠপাতার ঘষায় যে আগুন লাগে
১১. কুল, ধার
১২. নিঃশ্বাসের রন্ধ্রে মহাকাশকে জানা
১৪. নিশাকাল
১৬. শিলিগুড়ির কাছেই এই লেকে কিন্তু জল আছে
১৮. আকবরের ঠাকুর্দা জাহির উদ্দিন মহম্মদকে যে নামে আমরা চিনি
২০. সবচেয়ে ছোট যে কিনা লসাগুর গোড়া
২১. উপযুক্ত সময়

উপর-নীচঃ

১. হায় বসন্ত ______ বয়ে যায়
২. ঈশ্বরের দূত
৩. আকাশ, সুরমা ভরা আঁখি যেখানে হানা দেয়
৪. যে এই সোনা কেনে, সে সোনা চেনে না
৬. চমকে উঠে সতর্ক হয়ে যাওয়া
৮. ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির বোনেদের বাড়ি এখানে
১০. রোমান্টিক এই শাহজাদা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ট্র্যাজিক নায়ক
১৩. যা সবার মধ্যে আছে এবং বিশেষ কিছু নয়
১৪. শাক্যমুনির পুত্র, ব্যাট হাতে দেওয়াল
১৭. ঢালু জমি
১৯. কাগের সাথে এর ঠ্যাং মিললে আর পড়বেন কী করে?

সমাধান পরের সংখ্যায়

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

LEARN BASIC JAVA PROGRAMMING

Gautam Biswas

Introduction:

The java “Programming Language” is a general purpose, concurrent, class based object oriented Computer language. It is normally compiled to the BYTE Code instruction by Virtual Machine Specification. Java runs on billions of devices, including computer, mobile devices, gaming console and many other devices.

Java programming Language originally developed by James Gosling at Sun Microsystems in 1995. The previous name of Java was Oak.

First program in Java:

1. Write a program in java to input two numbers and display the sum of the numbers.

Open BlueJ and create a class name Firstprogram and then type the below in Editor.

```
import java.util.Scanner;

public class Firstprogram

{

   static void main()

   {

      Scanner sc=new Scanner(System.in);

      int a,b,s=0;

      System.out.println("Enter Two numbers:");

      a=sc.nextInt();

      b=sc.nextInt();

      s=a+b;

      System.out.println("The Sum of the numbers is = "+s);

   }

}
```

After writing the program -> Compile the program -> then run the program. The output will be look like this:

Enter Two numbers: 20 & 10

The Sum of the numbers is = 30

Explanation:

In the first line of any java program, we have to import the java classes by the following statement:

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

import java.util.Scanner;

Then we have to give any name of the program using the following statement:

public class Firstprogram

Here name of the class given Firstprogram and followed by curly braces in the next line {

After that we have to write the following:

static void main()

followed by another curly braces in the next line.

Scanner sc=new Scanner(System.in);

By this statement we have to create an object(say sc) of the class Scanner to input data through the program.

Then we have to use the datatype(int for integer number, String for Sentence, char for character, float for decimal number ans etc) here we have to input two number and display the sum so three variables have taken a, b and s;

Next, we have to use the OUTPUT satatement to display the following:

System.out.println("Enter Two numbers:");

To INPUT data we following statement are required:

a=sc.nextInt();

b=sc.nextInt();

Now for calculation we have to use the following:

s=a+b;

and to display the result we have to again use the OUTPUT Statement

System.out.println("The Sum of the numbers is = "+s);

And to close the program two close curly braces for main and class we have to use:

}

}

By going through the above you have a simple and basic concept of Java programming.

Another Program (Simple Interest Calculator)

2. Write a program in java to input Principal Amount, Rate of Interest and Time. Calculate and Display the Simple Interest and Total Amount.

<u>Open BlueJ and create a class name Firstprogram and then type the below in Editor.</u>

```
import java.util.Scanner;
public class Simpleinterest
```


সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

```
{
  static void main()
  {
    Scanner sc=new Scanner (System.in);
    float pa,r,t,si=0,amt=0;
    System.out.println("Enter Principal Amount (In Rs):");
    pa=sc.nextFloat();
    System.out.println("Enter Rate of Interest (%):");
    r=sc.nextFloat();
    System.out.println("Enter Time (In Years):");
    t=sc.nextFloat();
    si=(pa*r*t)/100;
    System.out.println("The Simple Interest is = "+si);
    amt=pa+si;
    System.out.println("The Total Amount    is = "+amt);

  }
}
```

After writing the program -> Compile the program -> then run the program. The output will be looked like this:

```
Enter Principal Amount (In Rs): 5000
Enter Rate of Interest (%): 5
Enter Time (In Years): 10
The Simple Interest is = 2500.00
The Total Amount    is = 7500.00
```

Now you can try this following program:

3. Write a program in java to input Roll no, Student Name, Marks of Five subjects and display the Total Marks and Percentage.

4. Write a program in java to input Employee Number, Employee Name and Basic Salary display the

   Da (Dearness Allowance) = 60% of Basic Salary
   Hra (House Rent Allowance) =25% of Basic Salary
   Gross Pay= Basic Salary + da + hra
   Pf(Provident Fund) = 8% of Gross Pay
   Net Salary=Gross pay – pf

5. Write a program in java to input temperature in Celsius and display the temperature in Fahrenheit.
   (Hint:
   $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

To be continued...........

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

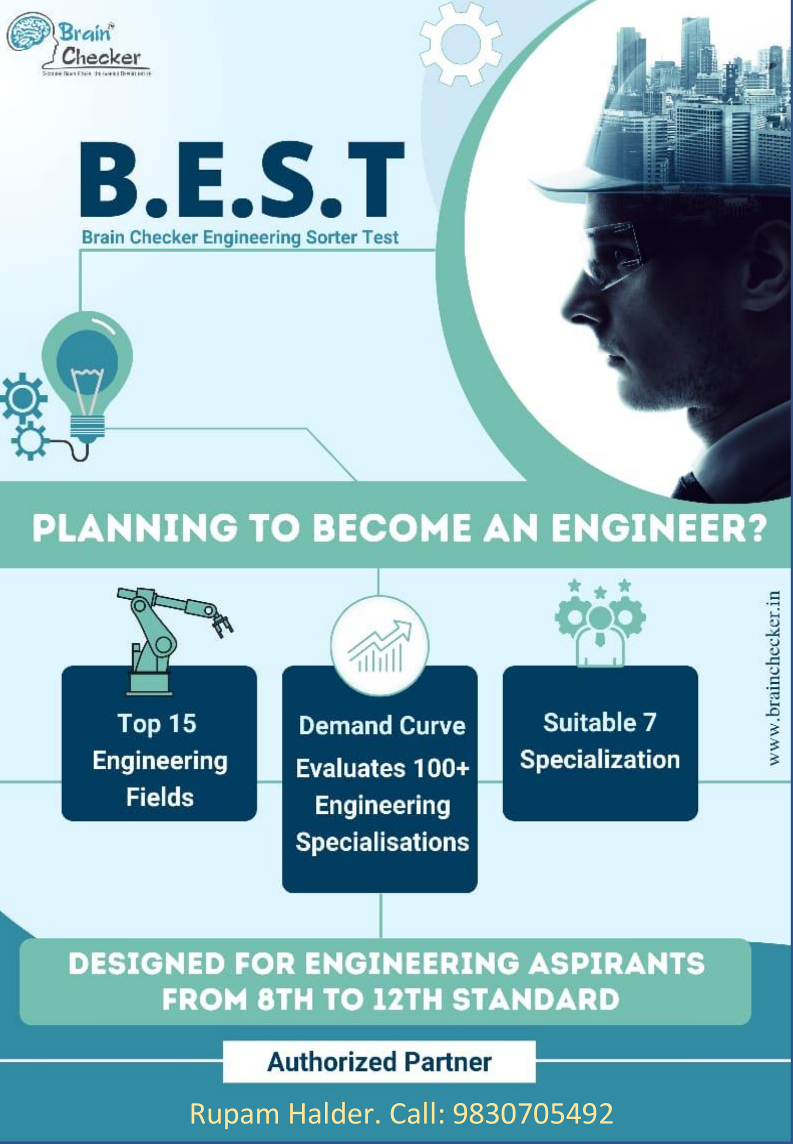
Brain Checker
B.E.S.T
Brain Checker Engineering Sorter Test
PLANNING TO BECOME AN ENGINEER?
Top 15 Engineering Fields
Demand Curve Evaluates 100+ Engineering Specialisations
Suitable 7 Specialization
www.brainchecker.in
DESIGNED FOR ENGINEERING ASPIRANTS FROM 8TH TO 12TH STANDARD
Authorized Partner
Rupam Halder. Call: 9830705492

Brain Checker
DECODING BRAIN POWER, UNLEASHING OPPORTUNITIES
CALIBER INTELLIGENCE QUOTIENT TEST
IQ TEST FOR AGED 13+
CIQT HIGHLIGHTS
60 MINUTES TEST
STUDENTS AGED 13+
ATTESTED BY EXPERTS
18 PAGE REPORTS
200+ CAREER
RECOMMENDATIONS
CIQT BY BRAIN CHECKER
India's first and the only real-time academic caliber evaluation tool for students aged 13 years & above
I E Q
education vision skills career interests values goals
Authorized Partner Rupam Halder. Call: 9830705492
www.brainchecker.in

Brain Checker
DECODING BRAIN POWER, UNLEASHING OPPORTUNITIES
MIT
MULTIPLE INTELLIGENT TEST
KNOW YOUR CHILDREN'S HIDDEN POTENTIAL & PERSONALITY
Suitable for talent evaluation of kids aged 3-13
MIT is Multiple Intelliigence Test which is based on Dermatoglyphics
MIT provides a Holistic Report on IN-BORN abilities of your child
MIT is purely based on scientific Analysis of Fingerprints
MIT Report is a 41 Paged Report having 95%* accuracy
Report are offered in English or Hindi
Authorized Partner
Rupam Halder. Call: 9830705492
www.brainchecker.in

Brain Checker
H-PACT
Evaluate I Engage I Empower
CORPORATE ASSESSMENT SOLUTIONS
Increase productivity by
22%*
A holistic evaluation of your team for human resource audit & strategic planning
Tie-Up
Implementation
Counseling
READY FOR IMPLEMENTATION
ASK THE TEAM TO ATTEMP THE TEST
GET REPORT & COUNSELING FROM TRAINED COUNSELORS
BROAD SPECTRUM EVALUATION FOR TEAMS
For Corporates, SME's, and MSME's
Authorized Partner Rupam Halder. Call: 9830705492

Mahanta Family

Wishes

All the best for

Team Saanko

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

দরিয়া

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অভিমান

টুকুন বড়ুয়া

বুকের ভেতর যে চাপা অভিমানটা এতদিন শ্রুতি জমিয়ে রেখেছিল আজ স্বামী সুদীপের একটা সইয়ের জোরে সরে গেল। সুদীপ চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে কিছু বছর হল, শ্রুতি গৃহবধূ।

এক ছেলে ও মেয়ে নীল, নীলাশাকে নিয়ে সাংসারিক জীবন নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে দু'জনে। নীল বিয়ে করে চাকরী সূত্রে অন্য রাজ্যে থাকে। নীলাশা বিবাহসূত্রে অন্য জেলায় থাকে।

বাবা হিসেবে সুদীপের কিছু চিন্তাধারাকে শ্রুতি সত্যিই সম্মান জানায়। কলেজ জীবন থেকেই শ্রুতি নারী-পুরুষের সমানাধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিচার করত। আর সুদীপের সাথে যখন পরিচয় হল তখন দেখা গেল সুদীপও একই রকম মত পোষণ করে। হয়ত এসব কারণেই তারা একে অপরের কাছে এসেছিল।

সময়ের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। পৈত্রিক সম্পত্তির উপর ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার- আজ আইন পাশ হয়েছে। তবে ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে যদি কেউ কারো সম্পত্তি নির্দিষ্ট কাউকে দিয়ে যেতে চায় সেটা দিতে পারে।

আর শ্রুতির যে অভিমান সেটা এখান থেকেই শুরু। শ্রুতিরা দুই ভাই এক বোন। দুই ভাই চাকরি করে। শ্রুতি খুব আদরেই বাপের বাড়িতে বড় হয়েছিল। শ্রুতির মনে হতো বাবা-মা তিন ভাই বোন মিলে এই সুখের সংসারের উপরে আর কিছু হয় না। সবার মাঝে কত মনের মিল কত ভালোবাসা। কিন্তু বিয়ের পর আস্তে আস্তে যেন সবকিছু একটু-একটু করে বদলে যেতে লাগল।

ভাইবোনেরা যে-যার সংসারে আস্তে আস্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটা সময় এল যখন শ্রুতির বাবা তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা দুই ছেলের নামে লিখে দিলেন। আর শ্রুতিকে সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। শ্রুতি বুঝতে পারল না এমনটা কেন হল! সন্তান তো তার পিতার ঔরসেই জন্মগ্রহণ করে- সে ছেলে হোক বা মেয়ে। তাহলে পিতার সম্পত্তির উপর মেয়ে হিসেবে শ্রুতির কেন অধিকার রইল না? শ্রুতি তাই ভাবে তাহলে কী সে তার বাবার ঔরসে জন্মায় নি!

সন্তানের প্রতি দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গি কেন! অভিমানে অঝোরে কেঁদেছিল শ্রুতি সেদিন। সুদীপ সেদিন জড়িয়ে ধরে শ্রুতিকে বলেছিল, "আমাদের নীলাশার সাথে এমনটি হবে না। আমার যা কিছু আছে আমাদের দু'জনের পরবর্তীতে আমার দুই ছেলে-মেয়ে সমান ভাগে সে সম্পত্তি ভোগ করবে। কারণ নীলাশা আমার ঔরসেই হয়েছে। আমার কাছে নীল ও নীলাশা সমান।"

আজ সেই দিন, সুদীপ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দুই ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল, যার মালিকানা তারা সুদীপ ও শ্রুতির মৃত্যুর পরে ভোগ করতে পারবে। এত বছর ধরে বুকের ভিতর যে অভিমানটা জমে ছিল, আজকের সুদীপের এই সিদ্ধান্ত শ্রুতির সেই অভিমানটাকে বুকের ভেতর থেকে সরিয়ে দিল।

আজ শ্রুতির নিজেকে দারুন হালকা মনে হচ্ছে, স্বচ্ছ বাতাস যেন বুকের গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করল। শ্রুতি বুক ভরে শ্বাস নিল।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

আমার চোখে ছেলেবেলার কামাখ্যাগুড়ি স্কুলের কিছু স্মৃতি

ডঃ প্রণব কুমার সাহা

১৯৬৫ সাল, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলছে তখন আমি দশ বছরের বালক, আমাদের বিদ্যালয়ের ভিতরে সচেতনতা শিবিরে মহড়া হতো কিভাবে যুদ্ধ বিমান থেকে বোমাবর্ষণ হলে আত্মরক্ষা করতে হবে এবং ওখানে ওইসব দেখতে ভীড় করতাম।

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম কামাখ্যাগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি জেলার (বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলা) রিফিউজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অর্থাৎ তৎকালীন (১৯৬৪ সাল) বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কামাখ্যাগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অনেক শিক্ষকই প্রাণ ভরে ভালোবাসতেন

প্রথম স্থান অধিকারের সুবাদে। আমাদের সময় মাধ্যমিক বলে কিছু ছিল না। নবম শ্রেণী থেকে কলা, বিজ্ঞান ও বানিজ্য বিভাগ শুরু হতো আর একাদশ শ্রেণীর পর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে হতো। আমি অবশ্য বিজ্ঞান বিভাগেই ছিলাম।

ওই সময় বাংলা শিখেছিলাম সমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী স্যার, ইংরেজি - শচীন সরকার স্যার, অঙ্ক - সুধীন্দ্রনাথ বিশ্বাস স্যার, বিজ্ঞান - অরুণ ঘোষ(দুলু), সংস্কৃত - পন্ডিত স্যার, হিন্দি - সনত সাহা স্যার। এছাড়া নন্দী স্যার, রহমান স্যার (যিনি জেলাপরিষদের সভাপতিও হয়েছিলেন), গোপাল চন্দ্র সাহা (যিনি আমার নিজের কাকা ছিলেন এবং যার কাছে থেকে আমি আজ আমার সাফল্যের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি) এবং আরো অনেকের কাছেই পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এখানে যাদের নাম উল্লেখ করলাম তাদের মধ্যে একমাত্র অরুণ (দুলু) স্যারই জীবিত আছেন।

ওই সময়ে বিকেল হলেই আমরা জমায়েত হতাম হাইস্কুলের খেলার মাঠে। ওই মাঠে কতকিছু হতো। প্রাত্যহিক খেলাধূলা

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ছাড়াও ফুটবল টুর্নামেন্ট হতো, এমনকি চাটাইয়ের বেড়া লাগিয়ে রানিং ও শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টও হতো। বড় বড় ক্লাব খেলতে আসত। তখন আমরা ছোটরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে মাঠে ঢুকে যেতাম। শীতকালে ক্রিকেট খেলা হতো।

আবার মাসব্যাপী বড় বড় সার্কাসের তাঁবু পড়ত। তাঁবুর চূড়া এত উঁচু হতো যে ঘাড় কাত করে দেখতে গিয়ে অনেক সময় পেছন দিকে পড়ে যেতাম। আর দূর্গাদশমীতে যে মেলা বসতো আর আশেপাশে এত বড় মেলা কোথাও হতো না। পাশের মড়ানদীতে প্রতিমা বিসর্জন হতো, সে যে কি আনন্দ এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সেই বাঁধ ভাঙা আনন্দ থেকে যে বঞ্চিত এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

বিকেলে খেলার মাঠে যাবার একটা নেশা ছিল। ওই সময় কামাখ্যাগুড়ির নামি ফুটবল খেলোয়াড় যা ছিলেন যথাক্রমে নিধির আইচ, পরিমল ভাওয়াল, মুকুল সরকার প্রমুখ। ওনারা খেলতেন আর আমরা ছোটরা বল কুড়িয়ে দিয়ে অসীম আনন্দ পেতাম। আর মাঠে বসে থাকাকালীন মাঝে মাঝেই হঠাৎ কানে টান খেতাম। পিছনে তাকিয়ে দেখতাম ধূতি পরিহিত সৌম্যকান্তি আমাদের সবার প্রিয় হেডস্যার - সুধীর চন্দ্র ঘোষ আমার কান টেনে জিজ্ঞেস করছেন, "কি রে কান টানলে মাথা আসে?" না বললেও বিপদ, হ্যাঁ বললেও। যাইহোক পরক্ষণেই কী যে আদর করতেন আর একটা লজেন্স হাতে গুজে দিতেন আর বলতেন এবারেও পরীক্ষায় প্রথম হওয়া চাই। হলফ করে বলতে পারি সেই আদর আজকালকার ছেলেমেয়েদের কল্পনার অতীত। আমার তো মনে হয় এখনকার ছাত্র-শিক্ষকদের সেই সম্পর্কই গড়ে ওঠে না।

হেড স্যার তখন প্রয়াত হলেন দিনভর কেঁদে ছিলাম আর সারাদিন ধরেই কামাখ্যাগুড়ি ও তার আশেপাশের লোকজন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভীড় করেছিল।

কিছুদিন পরেই নারায়ণ সাহা নূতন হেড স্যার হলেন আর আমিও স্কুল পরিবর্তন করে আলিপুরদুয়ার কলেজিয়েট স্কুলে চলে এলাম। পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলাম নারায়ণ চন্দ্র সাহা স্যার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের হেড স্যার হয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন ও বয়েজ স্কুলকে এক উন্নত মানের স্কুলে পরিণত করেছিলেন।

সময় করে এখনও মাঝেমধ্যে স্মৃতি রোমন্থন করতে ওই স্কুলে যাই ও ছেলেবেলা ফিরে পাই।

ঈশ্বরের মতন

বাপ্পাদিত্য

আরেকটু কাছে যেতেই পারতাম না-হয়।
তোমার অসুস্থ শরীরে নিজেকে রেখে দেখতাম,
কতখানি অভিমান পুষে -
জন্মচিহ্নের মতন খোদাই হল দূরত্ব।

আরেকটু বেশি করেই না-হয়
বলা দরকার ছিল গলা ফাটিয়ে -
কাঁদতে পারলে?

ঈশ্বর নেই আমার,
বন্ধু নেই, গীর্জায় যাই না, মন্দিরেও না।
শুধু তোমার কাছেই যাই - যতটুকু অবসর।

কিন্তু, বোধহয় –
আরেকটু বেশি করে কাছে যেতে পারতাম।

ঈশ্বরের শরীর ছুঁয়ে তিলক আঁকি না,
মায়ের মুখে নিন্দা শুনি তাই।
তোমার অসুস্থ শরীর ছুঁলে কষ্ট হয় ভীষণ,
ঈশ্বরের ইশারার কথা মনে পড়ে....

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অদৃষ্ট

সন্দীপ রায়

-১-

"এই পচা পাঁচ নম্বরে একটা ফুল মীল ছ'নম্বরে এক প্লেট রুটি তড়কা, আট নম্বরে এক কাপ চা। শুনেচিস?" রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে একটানা কথাগুলো চেঁচিয়ে বলে উঠে মুহূর্তের জন্য থামলেন পরেশ মুৎসুদ্দী। কিছুক্ষণ কানখাড়া করে থাকার পরেও পচার তরফ থেকে কোন উত্তর না পাওয়ায় অন্নপূর্ণা টিপিন সার্ভিসের মালিক পরেশ মুৎসুদ্দীর গলা আবার চড়ল "এই পচা শুনতে পেয়েচিস, নাকি ভরদুপুরে গাঁজা টেনে ঘুমুচ্ছিস?"

পচা গঞ্জিকা সেবন করে ঘুমোচ্ছিল কিনা তা বোধহয় স্বয়ং ভগবান ভোলানাথই বলতে পারবেন। মোদ্দা কথা অন্নপূর্ণা টিপিন সার্ভিসের মালিকের হম্বিতম্বিতে বিশেষ কাজ হলনা। রান্নাঘর আগের মতোই নিস্তব্ধতায় ডুবে রইল।

"তবে রে সুমুন্দির পো? আজ তোরই একদিন কি" কথাটা পুরো শেষ করার আগেই পরেশ মুৎসুদ্দীর একশ দশ কেজির শরীরটা রান্নাঘরের দরজা ঠেলে তীরগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনের একটা টেবিলে খানদুয়েক আনকোরা নতুন ভদ্রলোক বসে বসে পাঁপরের মতো কুড়মুড়ে পাউরুটিতে ব্যাজার মুখে কামড় বসাচ্ছিলেন, তারা পরেশ মুৎসুদ্দীর এই অলিম্পিকসুলভ গতিবেগ দেখে হাঁ করে বসে রইলেন। পাশের টেবিল থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক তাদের দেখে ঈষৎ গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, "এ তল্লাটে নতুন বুঝি?" তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই সুরুৎ শব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফের বললেন, "ও কিছুনা, এসব এখানে রোজ হয়। বুঝলেন কিনা ওই পচা হতভাগা যখন তখন যেখানে সেখানে"

"গাঁজা খায় বুঝি?" কোনোরকমে পাউরুটির টুকরো গলায় ঠেলে প্রশ্ন করলেন এক ভদ্রলোক।

বয়স্ক ভদ্রলোকটি কথার মাঝখানে বাধা পড়ায় বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন, রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন, "আজ্ঞে না, ঘুমিয়ে পরে।"

পিছন থেকে একটা হালকা হাসির রোল উঠল। এক ভদ্রলোক এককাপ চা আর বারোয়ারি খবর কাগজখানা বগলদাবা করে গত আধঘন্টা ধরে কোণের একটা চেয়ার দখল করে বসেছিলেন। তিনি এবার কাগজখানা মুড়ে খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠে বললেন, "শুধু কি ঘুমিয়ে পরে? সেবার তো তরকারিতে নুন দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারপর যা কান্ড।" আবার একপ্রস্থ হাসির রোল উঠল হোটেলের কোণায় কোণায়।

হোটেলে উপস্থিত সবাই সেই হাসিতে সামিল হলেও একা একটি লোক কিন্তু সেই হাসিতে যোগ দিতে পারলনা। লোকটির নাম ফটিক। সে এতক্ষণ হোটেলের একেবারে শেষমাথায় বসে একদৃষ্টে পরেশ মুৎসুদ্দীর দিকেই তাকিয়েছিল। তাকে রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে দেখে এবার ফটিকের মুখ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বড় ভারী দীর্ঘশ্বাস।

ফটিক একা-বোকা মানুষ। এর ওর বাড়ি টুকটাক মুনিষ খেটে দিন গুজরান হয়। সকালে চাটুজ্জেদের বাড়ি একটা ছোট কাজ করে হাতে কিছু নগদ এসেছিল, ভেবেছিল অন্নপূর্ণা হোটেলে দুপুরে ভরপেট ডিমভাত খেয়ে একটা তোফা ঘুম দেবে। কিন্তু এখানে এসেই ওর মেজাজটা খিঁচড়ে গেল।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

আরও একবার ভালো করে ভেবে দেখল ফটিক যে ও ঠিক দেখেছে কিনা। না কোন সন্দেহ নেই, ও ঠিকই দেখেছে পরেশ মুৎসুদ্দীর মাথা থেকে ঠিক হাতখানেক ওপরে একটা কালো মতো চাকা বনবন করে ঘুরছে। মানে হাতে সময় আর বেশি নেই।

পচার ঘুম ভাঙানোর ব্যবস্থা করে যখন পরেশ মুৎসুদ্দী হোটেলের কাউন্টারে এসে বসলেন ততক্ষণে হাসাহাসির শব্দ অনেকটাই থেমে এসেছে। ওনাকে ফিরতে দেখে ছ'নম্বর টেবিল থেকে আওয়াজ উঠল "ও পরেশদা আজ কপালে খাওয়া জুটবে তো?"

পরেশ মুৎসুদ্দী কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না, বদলে দু'হাতে টেবিলের কোণাটা খামচে ধরলেন। তার মুখ-চোখের ভাব দেখেই বোধহয় আগের সেই বুড়ো লোকটা এবার টেবিল ছেড়ে সামনে এগিয়ে এলেন, "কী হলো হে পরেশ শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

পরেশ মুৎসুদ্দী কোনোরকমে ডানহাতটা বাড়িয়ে সামনে রাখা জলের জগটা ধরার চেষ্টা করলেন, আর পর মুহূর্তেই তার বাঁ হাতটা দিয়ে নিজের বুকের বাঁদিকটা চেপে ধরল। সমস্ত হোটেল জুড়ে একটা সমবেত গুঞ্জন উঠল, "পরেশদা? কী হলো? ও পরেশদা।"

পরেশ মুৎসুদ্দী বোধহয় কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার আগেই তার সারা শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল একবার আর তারপর ঢলে চেয়ার থেকে নিচে এসে পড়ল।

মিনিটখানেক পরে রান্নাঘর থেকে পচা এককাপ চা হাতে বাইরে বেরিয়ে দেখল যে তার ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে তার মালিক নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

হোটেলের সব লোক পরেশ মুৎসুদ্দীর নিথর শরীরটাকে তুলে টেবিলে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ খেয়াল করল না কখন ফটিক চুপচাপ হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে।

****

ফটিক রাস্তার ধার বরাবর হাঁটতে হাঁটতে আনমনে নানান কথা ভাবছিল। যতবার এরকম কোনো একটা ঘটনা ঘটে ততবারই তার মনে হয় যে ভগবান ওকে এরকম করে কেন বানাল। কেন ও আগে থেকেই দেখতে পায় যে একজন লোক মরতে চলেছে। একটা জলজ্যান্ত লোক ওর চোখের সামনে আছি থেকে নেই হয়ে গেল। প্রতিবার ফটিক ভাবে যে এবার বোধহয় ও ভুল দেখেছে, এবার হয়ত কেউ মরবেনা, আর প্রতিবার অদৃষ্ট ওর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এত সহজে ওর নিষ্কৃতি নেই।

প্রথমবার ঠিক কবে এই জিনিসটা শুরু হয়েছিল, প্রথম কাকে ওই এইভাবে চলে যেতে দেখেছিল ফটিকের মনে নেই, শুধু মনে আছে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ও অবাক হয়ে দেখেছিল ওর মায়ের মাথার ঠিক ওপরে একখানা কালোপানা চাকা পাঁইপাঁই করে ঘুরছে। ফটিক অবাক হয়ে মাকে শুধিয়েছিল, "তোমার মাথার ওপর ওটা কি মা?"

ফটিকের মা অবাক হয়ে মাথার ওপরে হাত দিয়ে ঝেড়ে বলেছিলেন, "কই, কিছু নেই তো?"
ফটিক জোর-গলায় বলেছিল, "ওই তো, ওই যে কালো মতন?"

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মা হেসেছিলেন, ফটিকের কথা বিশ্বাস করেননি। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে ফটিক ছুটে মায়ের কাছে গিয়ে দেখে মা মাটিতে পরে আছেন, তার পায়ে দুটো ছোট ছোট ফুটো। বাবা পরে বলেছিলেন যে মাকে নাকি সাপে কেটেছিল, কিন্তু ফটিক জানে সাপে না কাটলেও ওর মা ওকে ঠিকই ছেড়ে চলে যেত। ও যে দেখেছিল মায়ের মাথার ওপর ওই কালো চাকাটাকে ঘুরতে।

সেই শুরু, তারপর একে-একে বাবা, হরিখুড়ো, পঞ্চানন কাকা আরও কতকে। আগে ফটিকের খুব কষ্ট হতো, খুব কান্না পেত। আজকাল আর পায়না। শুধু বিরক্তি হয়। যে লোকটা মরতে চলেছে ওর ওপর আর নিজের ওপর।

****

এইসব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছিল ফটিক হঠাৎ পিছন থেকে একটা আওয়াজ শুনেও থমকে দাঁড়াল। পিছন থেকে কেউ ডাকছে, "ফটকে আই ফটকে, দাঁড়া বলছি।"

ফটিক পিছন ফিরে দেখল চাটুজ্জেদের বাড়ির বড় ছেলে পিছন থেকে ওকে হাত নেড়ে ডাকছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ফটিক হাতজোড় করে দাঁড়াল, "আজ্ঞে কত্তামশাই?"

অবনী চাটুজ্জে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "বলি লোক ঠকানো কাজকারবার কবে থেকে ধরলি হ্যাঁ? টাকাপয়সা বুঝে নেওয়ার সময় তো বাবুর ভুল হয়না।"

বক্তব্যের সারমর্ম কিছু বুঝে উঠতে না পেরে ফটিক হাঁ করে তাকিয়ে রইল। অবনী চাটুজ্জে ফটিকের একখানা হাত চেপে ধরে বললেন, "একটা ছোট কাজ দিয়েছিলাম, খোকার জন্য তক্তা কেটে একখানা দোলনা বানিয়ে দিতে বলেছিলাম, তা তুই যেটা বানিয়েছিস ওটাকে দোলনা বলে? খোকা ওটাতে চড়তে পারবে? চল ঠিক করে দিবি চল।" ফটিকের হাত ধরে একটা টান মারলেন অবনী।

অন্য কেউ হলে হয়ত ফটিক মানা করে দিত, এমনিতেই এখন ওর মনমেজাজ ভালো নেই। কিন্তু অবনীকেও মানা করতে পারলনা। সকালে যখন দোলনাটা ও বানাচ্ছিল খোকা সারাক্ষণ ওর পিছন পিছন ঘুরঘুর করছিল। খোকার মুখের হাসি দেখেই ফটিক বুঝে গিয়েছিল যে ও কতটা খুশি। সেই খোকার দোলনা ঠিকঠাক বানানো হয়নি দেখে ফটিকের নিজেরই খারাপ লাগছিল।

অবনী চাটুজ্জের দিকে তাকিয়ে ফটিক মৃদু গলায় বলে উঠল, "চলেন কত্তা।"

****

দোলনা বানানো শেষ করে যখন ফটিক উঠে দাঁড়াল তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফটিক, আজ আর খাওয়া দাওয়া হলনা। রাতে চারটে মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিয়ে কাল না-হয় দেখা যাবে।

"কিরে কাজ হয়েছে?" প্রশ্নটা শুনে ঘুরে তাকাল ফটিক। অবনী চাটুজ্জে কাজ দেখতে এসেছেন। "আজ্ঞে কত্তা" কথাটা বলে দু' পা সরে দাঁড়াল ফটিক।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অবনী, দোলনাটা ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সন্তুষ্টমনে বলে উঠলেন, "বাহ্, এই তো বেশ হয়েছে। এবার আর খোকার বসতে অসুবিধা হবেনা। তা তোর খাওয়া দাওয়া হয়েছে?"

ফটিক নীরবে মাথা নাড়ল।

"তবে আর কী গেরস্থবাড়িতে দুপুরে না খেয়ে কাজ করে উদ্ধার করেছেন আমায়। যা ভিতরে গিয়ে কর্তামা কে বল একবাটি মুড়ি মেখে দেবে। এই অবেলায় আর ভাত খেয়ে কাজ নেই।"

ফটিক হাসি মুখে বাড়ির ভিতরে পা বাড়াল।

****

"তা ফটিক, একা একা এইভাবে কদিন চলবে? এবার একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে বিয়ে-টিয়ে কর। এইভাবে এর বাড়ি, ওর বাড়ি কাজ করে কী দিন চলে?" মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন অনুপমা।

ফটিক মেঝেতে পায়ের কাছে বসে নারকোল কুচি দিয়ে মাখানো মুড়ি আয়েশ করে চেবাচ্ছিল। জবাবে গাঁইগুঁই করে কী বললো অনুপমা কিছুই বুঝতে পারলেন না। আরও এক টুকরো নারকোল কেটে ফটিকের বাটিতে দিতে দিতে বলে উঠলেন, "আগে খেয়ে নে, খেতে খেতে কথা বলতে নেই, বিষম লাগবে।"

ফটিক খাওয়া থামিয়ে একঢোঁক জল খেয়ে প্রশ্ন করল, "খোকাবাবুকে তো দেখছিনে, সে কোথায়?"

"অমূল্য ঘুমোচ্ছে, উঠেই দৌড়োবে দোলনা চড়ার জন্য। যা একটা গেছো বাঁদর হয়েছে।"

ফটিক হাসল। এই ছোট্ট পরিবারটাকে দেখলে তার বুকের ভিতরটা ভরে ওঠে। এত বড়লোক, এত পয়সা অথচ একফোঁটা অহংকার নেই। নিজের মনেই অদেখা ভগবানকে কল্পনা করে একটা কাতর প্রার্থনা জানাল ফটিক। "ভগবান তুমি এদেরকে দেখো ভগবান।"

আর এক গাল মুড়ি হাতে তুলে মুখে ফেলতে যাবে ফটিক এমন সময় বাড়ির ভিতরের ঘর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এল, "আমার দোলনা কোথায়?"

অনুপমা হাসলেন, "ওই যে বাঁদর জেগেছে, আর ঘুম ভেঙেই দোল খাওয়ার শখ।" অনুপমার কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা চার-পাঁচ বছরের বাচ্ছা ছেলে ভিতরের ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। আর বাইরে এসেই ফটিককে দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠল, "ফটিক দাদা"

জবাবে ফটিকের হাত থেকে মুড়ির গ্রাস ছিটকে মুড়িগুলো মাটিতে ছিটিয়ে পড়ল শুধু। ফটিক ভয়ে দিশেহারা হয়ে দেখল তার খোকাবাবুর মাথা থেকে ঠিক একহাত ওপরে বনবন করে ঘুরছে একটা কালো চাকা।

****

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

-২-

"কিরে ওরকম হাঁ করে কি দেখছিস? ওকে প্রথমবার দেখছিস নাকি?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন অনুপমা।
ফটিক ধড়মড় করে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার পায়ের ধাক্কায় উল্টে পড়ল মুড়ির বাটি। অনুপমা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ফটিক কী হলোরে তোর?"

অমূল্য নিজেও বোধহয় অবাক হয়ে পড়েছিল। সে ফটিক দাদা বলে একপা এগোতেই ঘটল ঘটনাটা। ফটিক ছুটে অমূল্যর কাছে এসে ওকে একহাতে জড়িয়ে ধরে অন্যহাতটা ওর মাথার ঠিক ওপরে জোরে জোরে নাড়াতে শুরু করল। যেন শুধু হাতের জোরেও কিছু একটা ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে অমূল্যর মাথার ওপর থেকে। অমূল্য ভয় পেয়ে জোরে কেঁদে উঠতেই এবার অনুপমা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এলেন, তারপর জোর করে ফটিককে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "পাগল হয়ে গেছিস নাকি?"

ফটিক দু' পা পিছিয়ে গিয়ে তেমনি পাগলের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অমূল্যর দিকে। তারপর দু'হাতে নিজের মুখ চেপে একটা অস্ফুট শব্দ করে একছুটে পালিয়ে গেল ওখান থেকে।

অনুপমা হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ফটিকের ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া শরীরটার দিকে। আর মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে অমূল্য ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠল, "ফটিক দাদা দুষ্টু। ফটিক দাদা ভালোনা।"

****

চাটুজ্জেদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে বুড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে লুকিয়ে বাড়ির দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ফটিক। ওখান থেকে পালিয়ে এলেও বেশি দূর যেতে পারেনিও। পা যেন নিজের থেকেই এই গাছের গোড়ায় এসে আটকে গেছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি কিছু একটা হল এই বুঝি ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ, চীৎকার ভেসে এল। বুকের ভিতরটা কেমন খালি-খালি মনে হচ্ছিল ওর। লোকে বলে কাপুরুষরা নাকি আত্মহত্যা করে, আজ যদি ওই কাপুরুষদের মতো একটুকরো সাহস জোটাতে পারত ফটিক।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ ভেসে এলনা, তখন সাহসে ভর করে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ফটিক। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চাটুজ্জেদের বাড়ির গেটের কাছে এসে ফাঁক দিয়ে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল ও। ডুবন্ত মানুষ যেমন সামান্য খড়কুটো পেলে তাকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে তেমনি একটা ছোট্ট আশাকে আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা করছিল ফটিক। এখনও যখন কিছু হয়নি, তখন আর কিচ্ছুটি হবেনা, নিশ্চই সে ভুল দেখেছে।

কিন্তু মানুষ যখন এই ভেবে আশায় বুক বাঁধে যে আর খারাপ কিছু হবেনা, তখন যে আঘাত নেমে আসে তার থেকে মর্মান্তিক আর কিছু কী হতে পারে। ফটিক যখন প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে আর কিছু হবেনা, তখনই ঘটল ঘটনাটা। বাগানের দিক থেকে একটা ধপ করে আওয়াজের সাথেই ভেসে এল ছোট্ট বাচ্ছার কণ্ঠে একটা কান্নার শব্দ আর তার ঠিক পরের মূহুর্তেই ভেসে এল অনুপমার আর্তচিৎকার "খোকা।"

হুঁশ জ্ঞান সব হারিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে বাগানের দিকে ছুট লাগাল ফটিক। আর বাগানের সামনে পৌঁছে দেখল খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে বসে আছেন অনুপমা। খোকার মাথা থেকে ভেসে আসা রক্তে ভিজে যাচ্ছে তার শাড়ির আঁচল। আর অনুপমার পায়ের ঠিক কাছে মাটিতে ভেঙে পড়ে আছে খোকার সাধের দোলনা।

****

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

খড়ের গাদায় আগুন লাগলে যেমন তাকে চেপে রাখা যায়না, ভুসভুস করে ধোঁয়া বেরিয়ে চারদিক অন্ধকার করে দেয়, ঠিক তেমনি চাটুজ্জেবাড়ির দুর্ঘটনার খবরটা মুহূর্তের মধ্যে গোটা শিমুলিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক এসে যখন চাটুজ্জেদের বাড়িতে পৌঁছল তখন সুরেন ডাক্তার সবেমাত্তর অমূল্যকে দেখে বাইরে বেড়িয়েছেন। অবনী চাটুজ্জে ডাক্তারবাবুর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে শুধোলেন, "ডাক্তারবাবু, খোকা ঠিক হয়ে যাবে তো?"

সুরেন ডাক্তার মুখখানা বেজায় গম্ভীর করে থমথমে গলায় বলে উঠলেন, "মাথায় চোট লেগেছে, ভিতরে আঘাত কতটা গুরুতর সেটা বোঝা মুশকিল। আজকের রাতটা না কাটলেতো।"

ডাক্তারবাবুকে এইভাবে চুপ করে যেতে দেখে উপস্থিত সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল। অবনী চাটুজ্জে কান্নার দমক চাপতে চাপতে কোনোরকমে বলে উঠলেন, "আমার ছেলেটা বাঁচবেতো ডাক্তারবাবু।"

"না, খোকাবাবুরে বাঁচানো যাবেনা।"

পিছন থেকে ভেসে আসা আওয়াজটা কানে যেতে উপস্থিত সবাই একসাথে পিছন ফিরে তাকাল। সুরেন ডাক্তার বোধহয় ডাক্তারসুলভ একখান আশ্বাসবাণী দিতে যাচ্ছিলেন, বাক্যিখানা শুনে তার মুখের কথাটা মুখেই থেমে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল ভাঙা দোলনাটাকে বুকে চেপে ধরে ফটিক মাটিতে বসে আছে। কথাখানা তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে।

ফটিক দোলনাখানার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আবার বলে উঠল, "তোমরা সব মিথ্যাই চেষ্টা করছ, আমি জানি খোকাবাবুরে কিছুতেই বাঁচানো যাবেনা।"

প্রথমবার কথাটা শুনে অবনী চাটুজ্জে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরপর দু'বার একই কথা শোনার পর তিনি আর নিজের রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। ফটিকের গায়ে একখানা জোর লাথি মেরে গর্জে উঠলেন, "নেমকহারাম, শয়তান।"

লাথির চোটে উল্টে পড়েও ফটিক আবার উঠে দাঁড়াল তারপর ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলে উঠল, "যতই মারো কত্তামশাই, খোকাবাবুরে তুমি আর বাঁচাতি পারবেনা, ওরে যে আমি নজর দিয়েছি গো। খুব খারাপ নজর দিয়েছি। এই দ্যাখো দ্যাখো এই চোখ দিয়ে নজর দিয়েছি।" দু'আঙুলে নিজের চোখ দুটো বড়বড় করে দেখাল ফটিক।

মূহুর্তের জন্য যেন সারা চাটুজ্জেবাড়িতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে এল। অবনী চাটুজ্জে ফটিকের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ তার কানে গেল ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন বলছে, "পরেশদা যখন মারা গেল তখন এই ফটকেটা দোকানেই ছিল না? কেমন সুরুৎ করে কেটে পড়েছিল ওখান থেকে।"

ফটিকের এত কথাতে যে কাজ হয়নি এই একটা কথায় সেই কাজ হল। চাটুজ্জেবাড়িতে উপস্থিত সকলে বিষমরাগে একসাথে ফেটে পড়ল ফটিকের ওপর। অবনী চাটুজ্জে ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়ে দেখলেন ফটিকের রোগা পাতলা শরীরটা নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

****

"কেন মিথ্যে কথা বললি তুই? কেন বললি যে তুই খোকাকে নজর দিয়েছিস?" মাটিতে পরে ধুঁকতে থাকা ফটিকের মাথায় হাত দিয়ে শুধোলেন অবনী চাটুজ্জে।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ফটিক ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তার কত্তামশাইয়ের দিকে তাকাল একবার। সে দৃষ্টির সামনে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে ওর চোখের সামনে এক নতুন চেহারা ফুটে উঠল, ওর মায়ের চেহারা। ফটিক অবাক হয়ে দেখল তার মায়ের মাথার ওপর আজও একটা চাকা বনবন করে ঘুরছে, কিন্তু সে চাকার রং কালো নয় সাদা। উজ্জ্বল আলোর মতো সাদা। ফটিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "তোমার মাথার ওপর ওটা কী মা?"

আজ আর মা অবাক হয়ে মাথায় হাত দিলেন না, বরং মৃদু হেসে ফটিকের চুলগুলো নাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "তোর জন্য খেলনা নিয়ে এসেছি, নিবিনা?"

"খেলনা? আমার জন্য? কই দাও?" ফটিক একটা হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে"

মা আবার হাসলেন, "আগে চল আমার সাথে।"

ফটিকের শরীরটা কেঁপে উঠল একবার। যেন চার বছরের ছোট্ট ফটিক তার বড়বেলার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অবনী চাটুজ্জে ওর সামনে বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা চেপে ধরলেন। ফটিকের মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এল। যার মানে শুধু ফটিক জানে আর জানেন ওর মা। ফটিকের মা মুখ ঘুরিয়ে চাটুজ্জেদের বাড়ির দিকে তাকালেন একবার, তারপর ফটিকের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন, "আচ্ছা বাবা আচ্ছা, ওই খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবোনা হয়েছে? এইসব খেলনা নিয়ে শুধু একা তুই খেলবি। কী হিংসুটে ছেলেরে বাবা।"

ফটিকের ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। এই হাসি আনন্দের হাসি, অদৃষ্টকে হারিয়ে জিতে ফেরার হাসি। শেষ খেলায় আজ ফটিক জিতেছে, এবারবাড়ি ফেরার পালা।

অবনী চাটুজ্জে ফটিকের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন। তার চোখের থেকে এক ফোঁটা জল শুধু ফটিকের ঠোঁটের ওপর ঝরে পড়ল।

****

"মুখ খোলো তো খোকা, তোমার জিভটা একবার দেখি।" মুখের দিকে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে বললেন সুরেন ডাক্তার।

অমূল্য মুখ খুললনা, বদলে জিভ বের করে চোখ বন্ধ করে
ডাক্তারকে ভেংচি কেটে দিল। সুরেন ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন। অনুপমা রাগ করে বলে উঠলেন, "দিন-কে-দিন তুমি একটা বাঁদর হয়ে উঠছ। বড়দের সাথে কেউ এরকম করে?"

সুরেন ডাক্তার বাঁধা দিলেন "আহ মা, ছেলেটাকে বোকোনা তো, সবে সবে এত বড় একটা দুর্ঘটনা কাটিয়ে উঠেছে।"

অনুপমা অমূল্যকে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠলেন, "সত্যি ডাক্তারবাবু আপনি না থাকলে যে কী হতো?"

সুরেন ডাক্তার মাথা নাড়লেন, "না মা, আমি নই, তোমার ছেলেকে সাক্ষাৎ ভগবান বাঁচিয়েছেন, আমি তো প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।"

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অনুপমা অমূল্যকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সুরেন ডাক্তার ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বলে উঠলেন, "আপাতত আর কোনো চিন্তা নেই। এবার আমাদের অমূল্য মাস্টার দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলো সব করতে পারবে। শুধু দোলনা চড়া বন্ধ।"

অমূল্য ঠোঁট ফুলিয়ে প্রশ্ন করল, "কেন? দোলনা চড়া বন্ধ কেন?"

"বাহ রে, দোলনায় উঠলেতো তুমি পড়ে যাও। তাহলে তুমি কী করে দোলনা চড়বে?"

অমূল্য মায়ের হাত ছাড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে বলে উঠল, "আমি আর পড়বনা, এখনতো আমার বন্ধু আমার সাথে দোলনায় চড়ে।"

অনুপমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বন্ধু? কোথায় বন্ধু?"
অমূল্য খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল একবার। যেখানে একঝলক হাওয়া যেন অনুপমার প্রশ্নের উত্তরেই শান্ত দোলনাটাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল।

অমৃতা প্রীতম ও পিঞ্জর: দেশভাগের এক মর্মস্পর্শী ইতিকথা

শতরূপা মুখার্জি

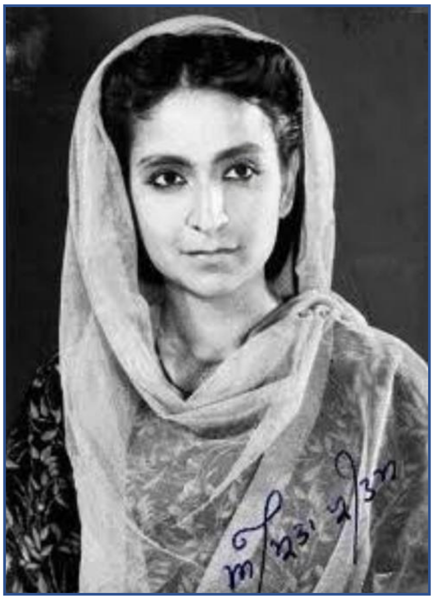

অমৃতা প্রীতম (১৯১৯ - ২০০৫) নামটি জুড়ে আছে এক যুগব্যাপী প্রতিবাদের সাথে। পাঞ্জাবী কবি ও সাহিত্যিক অমৃতা এমন একটা সময়ের প্রতিভূ যে সময়ে নারী সাহিত্যিক ভাবনাটাই অনেকটা ধোঁয়াশায় ভরা। তার ওপর সে নারী যদি প্রতিবাদী হন তাহলে তার চলার পথ কঠিন হয়ে পড়বে এতে আর আশ্চর্য কী, বিশেষত এমন একটি দেশে যে দেশ দু'শো বছরের পরাধীনতার পর সদ্য লাভ করেছে স্বাধীনতা, বিনিময়ে বলির কাঠে উঠেছে অনেক তাজা প্রাণ। যে দেশের মানুষদের দেশভাগের স্মৃতি সজীব, এবং দেশভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে তারা অসংখ্য ভিটেমাটি খোয়া যাওয়ার মানুষের হাহাকার, অসংখ্য নারীর সম্মানহানির প্রত্যক্ষদর্শী। অমৃতা নিজেও দেশভাগের যন্ত্রণার ভাগীদার। লাহোরে বড় হওয়া অমৃতা খুবই অল্পবয়সে মাতৃহারা হন, তার শিক্ষক ও কবি পিতার ছত্রছায়ায়ই তার কবি জীবনের সূত্রপাত। মাত্র তেরো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত লেহরান'।

ষোলো বছর বয়সে তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ এবং এই সময় নাগাদই তার বিয়ে হয় প্রীতম সিংহ-এর সঙ্গে। এই দুটি ঘটনাই তার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন তার এই কাব্যগ্রন্থ 'ঠান্দিয়ান কিরণ' তাকে পাঞ্জাবী সাহিত্য জগতে একটি নিজস্ব স্থান তৈরি করে নিতে সাহায্য করল, অন্যদিকে এই অসফল বিবাহটি তার পরবর্তী জীবনের রূপরেখাটি তৈরি করে দিল, যে ব্যতিক্রমী গতিপথটি ধরে তিনি এরপরে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সমস্তকিছুকেই প্রশ্ন করবেন। কিন্তু তার জন্যও অমৃতাকে পাড়ি দিতে হয়েছে এক দীর্ঘ পথ। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত লাহোরে এক সক্রিয় সাহিত্য

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

পরিমণ্ডলে তার চলাফেরা। এই সময় অবধি প্রকাশিত হয়ে গেছে তার ছয়টি কবিতা সংকলন। তার প্রথম দিকের কবিতা মূলত রোমান্টিক। কিন্তু ধীরে ধীরে অমৃতার কবিতার মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনা বোধের বিকাশ ঘটে, মূলত লাহোরে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স মুভমেন্টে যোগদানের পরবর্তী সময়ে তার লেখায় একটি অন্য মাত্রা যুক্ত হয়। ১৯৪৪এ তার 'লোক পীর' নামে এক কবিতা সংকলন প্রকাশ পায় যাতে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত ভারতের ভেঙে পড়া আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সরাসরি সমালোচনা করেছিলেন। এরপরেই আসে দেশভাগের সেই মর্মান্তিক সময়। বহু হিন্দু, শিখ ও মুসলিম পরিবারের পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যন্ত্রণার প্রতক্ষ্যদর্শী তিনি। একজন পাঞ্জাবী রিফিউজি হিসেবে তাকেও লাহোর ছেড়ে পরিবারকে নিয়ে পাড়ি দিতে হয় দিল্লিতে, তার প্রিয় মাতৃভূমি চোখের সামনে দু'খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। 'আজি আখান ওয়ারিশ শাহ নু' তার সবচেয়ে জনপ্রিয় দীর্ঘ কবিতা যেখানে তিনি সুফি কবি ওয়ারিশ শাহ-কে উদ্দেশ্য করে দেশভাগের শিকার, ছিন্নমূল এক মানুষের আর্তিকে তুলে ধরেছেন। 'হীর রঞ্ঝা' নামের দীর্ঘ প্রেম-উপাখ্যানের কবি ওয়ারিশ-এর কাছে তার আকুতি, কবর থেকে উঠে এসে তিনি যেন এই বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে আবার ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন। কবিতাটি লেখার সময় অমৃতা সন্তানসম্ভবা, আঠাশ বছরের এক রিফিউজি নারী যিনি পরিবারকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন এক সুদূর পথ। জনপ্রিয় উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ অমৃতার এই কবিতাকে যুগান্তকারী বলে বর্ণনা করেছেন ।

“Speak from the depths of the grave
to warish Shah I say,
And add a new page to your saga of love today.
Once wept a daughter of Punjab
Your pen unleashed a million cries
A million daughters weep today
To you warish Shah they turn their eyes “

(Translated by Amrita Pritam)

এর পরবর্তী জীবনে তিনি ভারতবর্ষের বাসিন্দা। যদিও দেশভাগ তার কাছে আ-মৃত্যু থেকে যায় একটি দুঃস্বপ্নের মতোই। তার লেখাও তাই তারই মতো দেশকালের সীমানাকে অবলীলায় অতিক্রম করে। শেষ জীবন অবধি ভারত এবং পাকিস্তান দু'দেশেই তার সাহিত্য জীবনের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৬০ সালে তিনি প্রীতম সিংহ-এর সাথে আইনি বিবাহ বিচ্ছেদ করেন, যে সময়ে ভারতীয় নারীদের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদও একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে পরিগণিত হতো। আর সেই সময় থেকেই তার লেখাও প্রবাহিত হতে থাকে সম্পূর্ণ অন্য খাতে। নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রশ্নগুলি থেকে শুরু করে পিতৃতন্ত্র, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অচলায়তনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠাই অমৃতার সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়। তার লেখা একাধারে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত, যুক্তিবাদী ও প্রাতিষ্ঠানিকতা বিরোধী। আজন্ম ভালোবাসার সন্ধানী অমৃতা তার লেখায় প্রেম, সম্পর্ক, মুক্তি এবং স্বাধীনতার সংজ্ঞাকে বারবার ভেঙেচুরে, উল্টেপাল্টে প্রচলিত ধারণার বাইরে নিয়ে গিয়ে এক অন্যতর রূপ দিয়েছেন, যা তার নিজের সময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। তার লেখায় অবলীলায় এসেছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা, অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের কথা, নারী- পুরুষের সম্পর্কের বহুস্তরী বিন্যাস। প্রগতিবাদী নারী সাহিত্যিক হিসেবে অমৃতা কিছু কম সমালোচনার সন্মুখীন হননি, কিন্তু নিজের মতবাদের বাইরে এক বিন্দু আপস তিনি কোথাও করেননি। তিনি অকুণ্ঠ সমালোচনা করেছেন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে এবং নিজেও এক দীর্ঘ জীবন শিল্পী ইমরোজ-এর সঙ্গে বিয়ের প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করেছেন। অমৃতা একাধারে লিখে গেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। তার লেখার ভাষা পাঞ্জাবী হলেও অনুবাদের মাধ্যমে তিনি সমাদৃত হয়েছেন সারা পৃথিবীর সাহিত্যজগতে। দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে অসংখ্য দেশবিদেশের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি, যার মধ্যে যেমন আছে পাঞ্জাব-রত্ন সম্মান, সাহিত্য আকাদেমি সন্মান, জ্ঞানপীঠ সম্মান, পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ সম্মান, তেমনি বুলগেরিয়া ও ফরাসী সরকার প্রদত্ত সাহিত্য

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সম্মানগুলি। অমৃতার জীবন ছিল তার সাহিত্যের মতোই স্বচ্ছ। নিজের ব্যক্তি এবং কবি-জীবনকে তিনি কখনও আলাদা করে ভাবেননি। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় তার আত্মজীবনী 'রশিদী টিকিট'। এই বইটির একটি বড় অংশ জুড়ে আছে বিখ্যাত উর্দু কবি সাহির লুধিয়ানভি-র সঙ্গে তার প্রেমের উপাখ্যান। এই আত্মজীবনীটি তার প্রথামুক্ত জীবনের এক নির্ঝর ভাষ্য। অমৃতার আত্মবিশ্লেষণ অনবদ্য। অনায়াসে তিনি তার নিজের কবিতা-জীবনের তুলনা টেনেছেন এক নিভন্ত সিগারেটের পুড়তে থাকা ছাইয়ের সাথে:

“There was a pain
I smoked it like a cigarette
And a few poems I flicked off
Like ashes from a cigarette”

(Translator unknown)

দেশভাগ নিয়ে অমৃতার আরেকটি অবিস্মরণীয় উপন্যাস হ'ল 'পিঞ্জর'। এই উপন্যাসটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক নারীর ছিন্নমূল হওয়ার আকুতি। এর প্রধান চরিত্র পুরু এক হিন্দু নারী যাকে এক মুসলিম যুবক অপহরণ করে। পুরু অনেক চেষ্টায় পালিয়ে তার মা-র কাছে ফিরে এলে তার পরিবার তাকে স্বীকার করতে চায় না। মাতৃভূমির মতো মাতৃস্নেহ থেকেও পুরু সারাজীবনের মতো বঞ্চিত হয়। রশিদ পুরুকে জোরপূর্বক বিয়ে করলে সে বাধ্য হয় ধর্মান্তরিত হয়ে তার হাতে 'হামিদা' নামটি খোদাই করতে। এই লস্ট আইডেন্টিটি পুরুকে কোথাও একটা এক করে দেয় কোটি কোটি বাস্তুহারা মানুষের সাথে। নিজের কষ্টের মধ্য দিয়ে পুরু তার আশেপাশের নারীদের কষ্টের সাথে একাত্ম হয়। পুরু থেকে হামিদা হয়ে ওঠার এই যুদ্ধ যেন পরিচয় হারানো এক নারীর এক নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠার কাহিনী। রশিদের সন্তানের মা হয়ে সে তার হারিয়ে ফেলা মাতৃসত্ত্বার মুখোমুখি হয়, ধীরে ধীরে পুরু তার পুরোনো পরিচয়ের খোলস ছেড়ে হামিদায় পরিণত হয়, সে ভালোবাসতে শুরু করে রশিদকে। তার সাহায্য ও সমর্থনে পুরু আরো দুই অসহায় নারী তারো এবং কাম্মোর পাশে দাঁড়ায়। নিজের জীবন বিপন্ন করে সাহায্য করে তার নিজের ভাইয়ের স্ত্রী লাজো-কে যাকে দাঙ্গার সময় একটি মুসলিম পরিবার বলপূর্বক আটকে রেখেছিল। রশিদ লাজোকে লুকিয়ে বের করে পুরুর কাছে নিয়ে আসে, অবশেষে তারা লাজোকে তার নিজের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ১৯৪৭ এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে যে অসংখ্য নারী নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছিল তাদের সব হারাবার যন্ত্রণা পুরু নিজের অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করে। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছদটি আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় যেখানে পুরু তার পুত্র, স্বামী রশিদ, ও লাজোকে নিয়ে ট্রেনে করে লাহোরে এসে মিলিত হয় তার বহুযুগ আগের ছেড়ে আসা ভাইয়ের সাথে, নিজে ফিরে যাওয়ার জন্য নয়, স্বামী বিচ্ছিন্ন লাজোকে তার স্বামীর হাতে তুলে দিতে। সে তার পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারে না ঠিকই কিন্তু লাজোর ফিরে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে কোথাও সে নিজের মাতৃভূমিতে ফেরার অদম্য বাসনাকে এক করে ফেলে। তার ভাই যখন তাকেও হিন্দু নারীর পরিচয় নিজেদের সঙ্গে বর্ডার পার করে ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে চায়, দিদি পুরু তখন ভাইয়ের হাত ছাড়িয়ে ফিরে এসে জড়িয়ে ধরে নিজের ছেলেকে ।

তার শেষ কথাটি দেশভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিকার অসংখ্য নারীর গন্তব্যে পৌঁছানোর আকুতির সঙ্গে মিলেমিশে যায়:
“Whether one is a Hindu girl or a Muslim one, whoever reaches her destination, she carries along my soul also.” (‘Pinjar' translated by Khushwant Singh)

পুরুর এই উপলব্ধি আসলে স্রষ্টা অমৃতার নিজেরই মনের কথা ।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

আমার প্রথম বেনারসী ও আমি

ঋতু মাহান্ত

জীবনের মধ্যাহ্নে পৌঁছে যখন কেউ কিছু লেখার অনুগ্রহ করে আমি তখন একটু বিব্রত বোধ করি কারণ লেখা আর চিন্তার যে সমপ্রবাহ তা আমার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই সাবলীল নয়। তাও আজ ভাবলাম যা ভাবি তাকেই একটু লিখে দেখি-না, হয়ত ভালো হবে না কিন্তু তাও চেষ্টা করতে কী-ই বা ক্ষতি!

আজ খুবই ইচ্ছে হ'ল গল্পটা বলি সেই বেনারসী শাড়ীটার। হ্যাঁ, এই অমূল্য পরিধেয়টি হয়ত সব বাঙালী মেয়ের আলমারিতে একটি বা দু'টি থাকে। আমার জীবনের প্রথম বেনারসীর প্রতি ভালোবাসা আমার আম্মা মানে আমার ঠাকুমার বিয়ের দুধে-আলতা রঙের রূপোলী স্বর্ণালী জরির বেনারসী দেখে। তখনকার দিনে ট্রাঙ্কে রাখা খাঁজে খাঁজে একটু ছিঁড়ে যাওয়া সেই বেনারসীটি পরবার আমার ভারী সুপ্ত ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে আর আমার হয়ে ওঠেনি কারণ আমার দুরন্ত স্বভাব ও বেনারসীর অবস্থা দেখে বাড়ীর কেউই খুব ভরসা করে উঠতে পারেনি যে আমরা একে অপরকে সামলাতে পারব!

যাই হোক, বেশ কিছুদিন পর আমার জীবনে সুযোগ এল আমার প্রথম বেনারসীটি পরার যখন আমি বেথুন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ইতিহাস বিভাগের জনা কুড়ি ছাত্রীর মধ্যে এক ভারী সদ্ভাব ছিল। আমাদের সেই বিভাগের একটি বন্ধুর শীতের শুরুতে বিয়ে ঠিক হ'ল আর আমাদের বন্ধুদের শুরু হ'ল পরিকল্পনা, আমরা কীভাবে আর কি পরে সেই বিয়েতে যাবো!

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে আমি বাড়ীতে মা ও আমার জেঠিমণিকে বললাম আমার একটা বেনারসী শাড়ী চাই বন্ধুর বিয়েতে পরার জন্য। মা আমায় তার পুরোনো বিয়ের ও বৌভাতের বেনারসী শাড়ী দেখিয়ে বলল, "তোর কোনটা পছন্দ?" আমি মায়ের বৌভাতের সেই তুঁতে রঙের সোনালী জরি ও লাল মিনাকারি কাজ করা বেনারসী শাড়ীটা পছন্দ করে বললাম আমি এটাই পরবো। তারপর বাড়ীতে দু'দিন এই বিষয়ে আলোচনা শুনতে শুনতে হঠাৎ করেই বাবা মাকে প্রস্তাব দিলেন মৌকে তো কখনো ভালো শাড়ী দেওয়া হয়নি, ওকে এই উপলক্ষে একটা ভালো বেনারসী কিনে দাও। আর নব্বইয়ের দশকে বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে বেনারসী পাওয়া বেশ একটা বড় ব্যাপার ছিল। যাই হোক, সেই প্রথম কলেজস্ট্রীটে মা ও জেঠীমণির সাথে গিয়ে আমার সুন্দর এক নিরেট সবুজ মানে সলিড সবুজ রঙের বেনারসী কেনা হ'ল। সে এক অপার আনন্দ, আমার জীবনের প্রথম বেনারসী। তারপর সেই বহু প্রতীক্ষিত বন্ধুর বিয়ের দিন আমার সেই বেনারসী, মায়ের গয়না পরে বিয়েবাড়ী যাওয়া। সেই আনন্দ, সেই হাসিমুখের ছবি পুরোনো অ্যালবামে এখনো জ্বলজ্বল করছে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, আরো বেশ কিছু বেনারসী শাড়ী যোগ হয়েছে আমার আলমারির শাড়ী সংগ্রহে। কিন্তু প্রথম পাওয়া সেই বেনারসী শাড়ী আমার স্মৃতিতে আজও সমানভাবে উজ্জ্বল।

আজ আঠারো বছর আমি প্রবাসী, বিয়ের পর প্রথম সংসার পাতা আমার মা, বাবার শহর থেকে সহস্র মাইল দূরে। আজ বেনারসী শাড়ী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমি ভাবলাম আমার পরিবারে আমার উপস্থিতিও সেই প্রথম পাওয়া বেনারসী শাড়ীটারই মতন। হ্যাঁ, সত্যিই আজ আঠারো বছর বিদেশে থেকে আমি যখন আমার বাবা-মায়ের কাছে যাই, কলকাতায় আমার পুরোনো পাড়ার সেই উত্তর কলকাতার বাড়ীতে, আমার উপস্থিতিটাও সেই তাকে তোলা বেনারসী শাড়ীটার মতনই। সবাই তাকে ভীষণ ভালোবাসে, ভারী যত্ন করে; কিন্তু কেউ তাকে নিত্যদিনের ব্যবহারে লাগাতে চায় না। তাই মা, বাবা, আমার প্রিয় জেঠিমণি বা আরো খুব আপনজন কেউই আমায় তাদের নিত্য সমস্যার কথা বলে না বা আশা করে না আমিও দৌড়ে গিয়ে বাবার সাথে বাজারটা করতে পারি, মাসিক ওষুধের ফর্দটা দোকানে দিয়ে আসতে পারি।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

জানি না, কোনোদিন আমিও বেনারসী শাড়ী থেকে সেই রোজকার মায়ের গায়ে লেপ্টে থাকা সোঁদা গন্ধ মাখা সেই ছাপা শাড়ীটা হতে পারব কি না? আজ জীবন মধ্যাহ্নে এসে মনে হয় সেই ছাপা শাড়ী হলে হয়ত মায়ের আরো কাজে লাগতাম, তার আরো কাছে তো থাকতাম!

কথারা কবিতা হবে

ভারতী ব্যানার্জী

কথারা মনের ভিতর কিলবিল করছে –
অথচ মনের ভাষাটাই যেন মরে গেছে।
ভাষা মরে গেলে, আর যাই হোক-
কবিতা লেখা হয় না।
তাই আমি খুঁজে চলেছি সেই জিয়নকাঠি;
যার পরশে ভাষা বেঁচে উঠবে,
কথারা ফুল হয়ে ফুটবে,
আমার ভেতরটাকে শান্তি দেবে।
পরম সেই শান্তি, এক নীরব শান্তি।
ঠিক তখনই সেটা একটা কবিতা হবে।

ঈশ্বর

সনজিৎ

ফুরিয়ে যাওয়া কথাদের মতো
নিভে-নিভে আসে সম্পর্কের আলো।
দূরে প্রত্যন্ত গ্রামে
কোনো এক অষ্টাদশী প্রদীপ জ্বালিয়ে
উত্তাপ দেয় ভালোবাসার তুলসীমঞ্চ।
আমি সেই দীপের বারংবার হাওয়ায়
কেঁপে-কেঁপে ওঠা রিনরিনে শিখা,
আমি সেই দীপের
তৈলাক্ত জ্বলে পুড়ে যাওয়া সফেদ সলতে
যার তলায় পড়ে থাকা অন্ধকারে
বাসা বাঁধে ঈশ্বর।

একটা উজাড় করে দেওয়া হাত

সুপ্রিয় সেন

আমি একটা উজাড় করে দেওয়া হাত খুঁজি
সব হাতেই কিছু লুকোনোর দাগ আছে
সব মনেই কিছু চেপে রাখা কথা আছে
মেঘ যেমন নিজেকে উজাড় করে বৃষ্টিধারায়
তেমনই একটা হাত খুঁজি, রাতের একলা বিছানায়।
কথা আর লেখার তফাৎ অনুভব করি
শব্দহীন কিছু কথা লিখে চলি
আকৃতিবিহীন কিছু এলোমেলো অক্ষর
অর্থহীনতার ডিসলেক্সিয়া।
সাদা গোলাপের কালো ছায়া।
কিছু কান্নার ঋণ এখনো রয়ে গেছে
চোখের জল নিঃসঙ্গতার নিষ্ঠুরতাকে ধুইয়ে দেয়
আমি একটু ভিজে যাই, একটু নরম হয়ে উঠি।
কোলবালিশের আদরে অর্ধ অবচেতনায়
তোমায় খুঁজে পাই, সাথে সেই একটা উজাড় করে
দেওয়া হাত।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

কাকতালীয়

পরিমল সিকদার

প্রথম দৃশ্য -

একশ', একশ' দশ - দুই চাকার মিটারের কাঁটাটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল, ফোর লেনের মসৃণ রাজপথ - হালকা শীতের পরশ। অনিমেষের গায়ে তখন সান্দাকফুর পশম। বহুদিন পরে গ্রামে গিয়ে গ্রাম-বাংলার সবুজ অক্সিজেন ফুসফুসে ভরে কার্বন-কলকাতায় ফিরে আসছিল। আরও দু'দিন থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কাল সন্ধ্যায় ওর দুটো গানের রেকর্ডিং আছে ওর নিজের 'cord less' স্টুডিওতে। মনে পড়তেই গুন-গুন করে দুটো গান একটু গেয়ে নিল। বাহ! বেশ স্নিগ্ধ সকাল। অনিমেষের মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল গান দুটো বেশ প্রাণ খুলে গাইতে হবে - রবীন্দ্রসংগীত গাইতে যে কী ভালো লাগে - উফ্ এত আধুনিক গান কী আর কেউ লিখতে পারবে? একটা মহাপ্রশান্তি ওকে আনমনা করে দিল। চলতে চলতেই "পথের শেষ কোথায়" থেকে শুরু করে , "এই পথ যদি না শেষ হয়" ইতিমধ্যেই গুনগুন করা হয়ে গেছে - গানের শিল্পী বলে কথা। রাস্তার দু'পাশে এখন গ্রাম বাংলার সবুজ শ্যামল ছবি, মনটা অচিরেই কেমন গানে গানে মেতে উঠল অনিমেষের - "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভা---" একটা বিকট আওয়াজ - চালক সিট থেকে দু'ফুট উপরে উঠে বাঁ দিকে আছড়ে পড়ল। আঘাতপ্রাপ্ত সামনের বাইকটার মাঝখান থেকে ভেঙে ব্যারিকেডের চেহারা নিল, স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ছিটকে রাস্তায়। গ্রামবাসীদের চিৎকার ভেসে এল।

দ্বিতীয় দৃশ্য -

"না না - একটু বাঁদিকে, এটাকে এই জায়গাটায় রাখলে হবে না - হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। ওই ফুলের টবটাকে ওই কোণায় রাখুন, আর একটু - আর একটু ডাইনে, ব্যাস ব্যাস।" লেন্সে চোখ বুলিয়ে নিয়ে নরেন উপরে তাক করল। সারি দিয়ে কাঠের তৈরী ভারী ভারী পুতুলগুলো ঝুলছে। ফটোগ্রাফার হিসাবে নরেনের বেশ নামডাক আছে কলকাতায় - এটাই ওর পেশা এবং নেশা। প্রতিদিনই কোথাও-না-কোথাও কাজ থাকেই, কালকেও যেতে হবে ষ্টুডিও 'cord less' এ। ওখানে ছ'টা গানের ভিডিও রেকর্ডিং। আজ অবশ্য এখানে পাপেট শো-র ভিডিও করতে এসেছে। এ ধরণের কাজ আগে ও করেনি। নরেন ভাবছিল পুতুল নাচের মতো লুপ্তপ্রায় শিল্পটাকে তাও কিছু শিল্পী আজও কোনোরকমে টিকিয়ে রেখেছে। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে - এত ভারী ভারী পুতুলগুলো দিয়ে শুধুমাত্র হাত আর আঙুলের কারসাজিতে কী অপূর্ব নৃত্যনাট্য পরিবেশন করায়, সেটা যে না দেখেছে বুঝতে পারবে না। নাহ, এই রেকর্ডিংটা খুব মন দিয়ে করতে হবে। আরও একবার ক্যামেরায় চোখ রাখল - নাহ্, সব ঠিকই আছে। "আপনারা এবার শুরু করতে পারেন" ব'লে দু'পা এগোতেই উপর থেকে একটা ভারী পুতুল দড়ি ছিঁড়ে সোজা নরেনের মাথার ওপর - "বাবা গো!"

তৃতীয় দৃশ্য -

দর্শকাসনের সত্তর শতাংশ আসন ভর্তি, এখনও একজন দু'জন করে দর্শক আসছে - সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হবে - আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পীর সাথে সঙ্গত করবে অন্য কোনো তবলাবাদক। গোকুল দ্বিতীয় শিল্পীর সাথে সঙ্গত করবে। সাজঘরে বসেই তবলার স্কেল মিলিয়ে নিচ্ছিল - টুং টাং কখনো হালকা হাতুড়ির ঘা, আবার টুং টাং। প্রথম শিল্পীর অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, দুটো করে গান বরাদ্দ এক-একজন শিল্পীর। মন দিয়ে শুনল - বেশ ভালো গাইছে, তবলাও বেশ ভালো বলছে। মনে মনে ভাবল কাল সক্কাল- সক্কাল আবার 'cord less' এ পৌঁছাতে হবে, ছ'টা গানের সাথে বাজাতে হবে। মোবাইলটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সাইলেন্ট মোডে রেখে দিল। প্রথম শিল্পীর গান শেষ। গোকুল ধীরে ধীরে স্টেজে গিয়ে বসল। দুটো রবীন্দ্রসংগীতের সাথে বাজাতে হবে, পরেরটা আবার ছয় নম্বর শিল্পীর সাথে - নজরুল গীতি। শিল্পী গান ধরতেই গোকুল ত্রিতালে ডুবে গেল। পরেরটা ঝাপতাল বাজিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে সাজঘরে ফিরে এসেই মোবাইল খুলল মেসেজ-টেসেজ কিছু আছে কিনা দেখে নিতে - "Come sharp"

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

চতুর্থ দৃশ্য -

সন্ধ্যা সাতটা - শীতের একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ। কলকাতায় আর সেরকম কী ঠান্ডা? নবেন্দু পাঞ্জাবীর উপর একটা হালকা মানানসই শীতের পোশাক পড়েই ষ্টুডিওতে চলে এসেছে। এস্রাজটা বড় ভালো বাজায় নবেন্দু। কলকাতার নামকরা স্টুডিও 'cord less' র সাথে ও যুক্ত। মাসের বেশিরভাগ দিন ওখানেই বাজাতে হয়। এর বাইরেও কিছু কিছু শিল্পীর জন্য অন্য ষ্টুডিওতেও কাজ করতে হয় - আজ যেমন এসেছে। নির্দিষ্ট জায়গায় বসে নবেন্দু এস্রাজটা বাক্স থেকে বের করে চাবিগুলো একবার বাঁদিকে একবার ডানদিকে ঘুরিয়ে তালা খুলতেই সুরের মূর্ছনা 'এসো রাজ করি' বলে জাঁকিয়ে বসল। আজ তিনটে গানের রেকর্ডিং - রবীন্দ্র সংগীত। তবলা, কী বোর্ড, এস্রাজ ন্যাচারাল-বি স্কেলে বেঁধে নিতেই পরিবেশটাই পাল্টে গেল। ক্যামেরার চোখ দিয়ে সবাইকে একবার দেখেই ফটোগ্রাফার বুড়ো আঙ্গুল দেখাল। রেকর্ডিস্ট সবার সাউন্ড চেক করে OK বলতেই প্রিল্যিউড শুরু হল। গায়ক কাঁপতে কাঁপতে "শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন" -এ গলা মেলাতে চেষ্টা করল।

তিনটে গানের রেকর্ডিং শেষ হবার পর নবেন্দু ঘড়ি দেখতে গিয়েই বিষম খেল - রাত পৌনে দশ। তড়িঘড়ি পেমেন্টটা নিয়েই নবেন্দু ট্যাক্সি করে বাড়ির পথে রওনা দিল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা তো লাগবেই পৌঁছাতে। ট্যাক্সির ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বেশ বয়স্ক ড্রাইভার, স্টিয়ারিঙের পাশেই মা কালীর ছবি, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভেতরটা। অনুষ্ঠানটা ভালো হওয়াতে নবেন্দুর মনটা ভালোলাগার আবেশে ফুরফুরে ছিল। ও পিছনের সিটে গা এলিয়ে দিল। আগামীকালও রেকর্ডিং আছে ষ্টুডিও 'cord less' এ, সকাল- সকাল বেরোতে হবে - তিনজন শিল্পী ন'খানা গান। মোবাইলটা খুলে গানগুলো একবার দেখে নিল। আবার ঘড়িটা দেখল - দশটা তিরিশ। হঠাৎই একটা হইচই শুনে সামনে তাকাতেই দেখল উল্টোদিক থেকে একটা ট্রাক হুড়মুড়িয়ে ওদের গাড়ির সামনে চলে এল। চোখের পলকে পোড় খাওয়া ট্যাক্সি ড্রাইভার বাঁদিকে কাটিয়ে নিতেই ট্রাকটা ডানদিকে কাত হয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ল। নবেন্দুর বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃদপিন্ড যেন এইমাত্র চালু হল। ট্যাক্সির ভেতরে রাখা মা কালীর ফটোটাকে এই প্রথম বার ওর মনে হল জ্যান্ত দেবী - কীভাবে আজ বেঁচে গেল কে জানে! ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে বাড়ি পৌঁছাতেই যে ষ্টুডিও থেকে ও এইমাত্র ফিরে এল, সেই ষ্টুডিওর ছেলেটার ফোন এল, "বাবার এক্সিডেন্ট হয়েছে, পা-টা বোধহয় গেছে।" নবেন্দু একটু হলেও কেঁপে উঠল, বলল, "কখন হ'ল?" ওপাশ থেকে উত্তর এল, "এইতো সাড়ে দশটা নাগাদ।" কোনোরকমে তালাটা খুলে ঘরের আলোটা জ্বালতেই আবার মোবাইল বেজে উঠল, ওপাশে অর্কর ফ্যাকাসে গলা, "শুনেছিস আজ সকালে তো অনিমেষের মারাত্মক এক্সিডেন্ট হয়েছে, ওর গ্রামের বাড়ি থেকে বাইকে করে ফেরার পথে, আর সন্ধ্যায় ভিডিও করতে গিয়ে নরেনের মাথায় গুরুতর চোট - দু'জনেই নার্সিং হোমে ভর্তি - কাল 'cord less' এর সমস্ত রেকর্ডিং বন্ধ। তুই একটু গোকুলকে জানিয়ে দিস।" সংক্ষেপে শুনেই নবেন্দু গোকুলকে ফোন করল, ওপাশ থেকে গোকুলের কান্না ভেজা উত্তর, "বাবা আর নেই রে! আটটায় খবর পেলাম, আমি ট্রেনে, বাড়ি যাচ্ছি।"

নবেন্দুর গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল, শরীরে একটা কাঁপুনি অনুভব করল। কেমন গা গুলিয়ে উঠছে। ঠান্ডা মাথায় ভাবতে বসল - মনে মনে বলতে লাগল, "একই দিনে একই স্টুডিওর তিনজনের জীবনে এমন কান্ড! তাহলে কী - তাহলে কী চতুর্থ জন আমি ছিলাম! আর একটু হলেই তো আমি ট্রাকের তলায় পিষে যেতাম—" ও ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ল। "হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমি কোনোরকমে রক্ষা পেলেও ওই একই সময়ে ঠিক সাড়ে দশটায় আমার ঘটনাটা অরুণের বাবার ওপর দিয়েই ঘটল।" গায়ে কাঁটা দিতে লাগল, অজানা ভয় গ্রাস করতে লাগল। এরকম ঘটনা আগেও শুনেছে, কিন্তু ও নিজে খুব বাস্তববাদী, বিশ্বাস করতে চায়নি। আজ নিজের সাথেই ঘটে গেল - বিশ্বাস করবে নাকি কাকতালীয় ঘটনার প্রলেপ দিয়ে নিজের মনের সাথে বোঝাপড়া করবে - অদ্ভুত এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে নতুন সকালের অপেক্ষায় রাতের প্রহর গুনতে লাগল।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ঘড়ি

সুদীপ সরকার

রাতের ঘুম ভবানীবাবুর কপালে নেই। গতকালও শুতে শুতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। যদিও এটা নতুন কিছু নয়, রাতে জেগে থাকা আর বেলা দশটার পরে ওঠা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে ভবানী সরকারের। পুলিশের চাকরিতে নেহাত কম দিন তো হ'ল না। নয় নয় করে সাতাশটা বছর সুনামের সাথে কাজ করে, খান পনেরো থানায় ডিউটি করে এখন তিনি মগরা থানার বড়বাবু। কোনো কোনো দিন খুব শান্তিতে কাটে, কোনো ঝামেলা নেই, কোনো এফআইআর নেই, বড় সাহেবদের কাছ থেকেও কোনো নির্দেশ আসেনি আর তখনি ভবানী বাবু শঙ্কিত বোধ করেন, একটানা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তো বিধাতা পুরুষ তার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেননি, সুতরাং কিছু একটা ঘটবে দু'এক দিনের মধ্যেই। দিন তিনেক আগে তেমনই হ'ল, সকাল থেকেই হুলুস্থুল কাণ্ড, মিঠাপুকুরের সোনা ব্যবসায়ী মনা বোসের বাড়িতে ডাকাতি। ব্যাটারা আলমারি, সিন্দুক ভেঙে সোনা দানা, টাকা পয়সা যা ছিল নিয়েছে, তবে মন্দের ভালো, কারোর গায়ে হাত দেয়নি। বহুদিন পরে এইরকম ডাকাতি হ'ল এলাকায়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ কিছুটা সন্ত্রস্ত। মিডিয়ার ঢক্কা নিনাদে তিল থেকে তাল হয়ে বড়বাবুর চাকরি নিয়েই প্রায় টানাটানি। বড় সাহেব ধমক দিচ্ছেন, নেতারা হুমকি দিচ্ছেন, অন্যদিকে মনা বোস দল পাকিয়ে শাসিয়ে গেছে, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ডাকাতির মাল উদ্ধার না হলে রাস্তা অবরোধ হবে। ভবানীবাবু থানার দায়িত্ব নিয়েছেন মাস ছয়েক হ'ল। সমস্ত সোর্স লাগিয়ে, দিনরাত এক করে নিজের অভিজ্ঞতা সম্বল করে একটা মরিয়া চেষ্টা শুরু করলেন ভবানী সরকার। লোকাল কোনো গ্যাংয়ের কাজ নয় অনুমান করে গঙ্গার ওপারে নৈহাটি কাঁকিনাড়াতেও সোর্স লাগালেন তিনি। শেষমেষ ডাকাত দলটি বামাল ধরা পড়ল কালনা থেকে। তুলনায় নবীন বলেই এদের পরিকল্পনায় কিছু শিথিলতা ছিল আর সেই সূত্র ধরেই ব্যাটাদের পাকড়াও করতে বেশি সময় লাগল না পুলিশের। গতকাল সারাদিন ধরেই জেলা সদরে ছোটাছুটি, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি করতে কেটে গেছে, কোর্টে পেশ করার জন্য যাবতীয় কাগজ পত্র তৈরি করতে করতে রাত কাবার। মিডিয়া এখন জেলা পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভবানী সরকার কোনোদিন ঘুষের ধার ধারেন না, অন্যরা এটা সেটা করলে খুব বাগরাও দেন না, দিন নেই রাত নেই পরিশ্রম করে যদি দু'পয়সা এদিক ওদিক করে আমদানি করেই বা, কি এমন এসে গেল। তবে নিজে পয়সাকড়ি না নিলেও, থানার জন্য এটা সেটা কেউ দিলে তাতে আপত্তি করেন না ভবানী। মনা বোস প্রায় সমস্ত খোয়া জিনিস ফেরত পাওয়ার পরে আপ্লুত হয়ে কিছু দেওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করতে শুরু করল। সুযোগ বুঝে ভবানীবাবু থানার জন্য কিছু ফার্নিচার কিনে বিল ধরিয়ে দিলেন মনা বোসকে। মনা বোস যারপরনাই খুশি হয়ে বিলের টাকা মিটিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ।

সকাল সকাল আজ আবার এক নতুন সমস্যা এসে হাজির। সাব ইন্সপেক্টার স্বদেশ মাকাল টহল দেওয়ার সময় ত্রিবেণী ঘাটে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়েকে ধরে নিয়ে এসেছে। কোয়ার্টারে খবর গেল, ভবানীবাবু হন্তদন্ত হয়ে ইউনিফর্মটা গায়ে চড়িয়ে থানায় এসে দেখলেন মেয়েটি তাঁর চেম্বারে বসে আছে। স্বদেশ মালাকারও এল পিছন পিছন। ভবানীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কি নাম তোমার? কোথায় বাড়ি? ত্রিবেণী ঘাটে কেন এসেছ?” মেয়েটি শুধু বলল, “আমার নাম প্রিয়াঙ্কা কাঞ্জিলাল। বাড়ি বহরমপুর।” স্বদেশ বলল, “স্যার, ও নাকি জলে ঝাঁপ দেবে বলে রেডি হচ্ছিল। এলাকার কিছু লোকের সন্দেহ হওয়ায় আমাকে খবর দিল, আমি থানায় নিয়ে এলাম।” প্রথমে কিছু বলতে না চাইলেও, ভবানীবাবুর খোঁচাখুঁচিতে মুখ খুলল প্রিয়াঙ্কা, জানা গেল, সে বিএসসি পড়ে। ত্রিবেণী এলাকার একটি ছোকরার সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ এবং সম্প্রতি একে অপরকে প্রেম নিবেদন। শেষ পর্যন্ত বিয়ের জন্য মরিয়া হয়ে তরুণীর গৃহ ত্যাগ। তারপর ছোকরাটির বাড়ি পর্যন্ত এসে হতাশ হওয়া। ফেসবুকের প্রেমিকাকে এইরকম মরিয়া হয়ে বাড়ি পর্যন্ত চলে আসতে দেখে ছোকরাটি ঘাবড়ে গেল, পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল, বেকার ছেলে, এখন বিয়ে-থা করার প্রশ্নই নেই, আর ফেসবুকে কত লোকের সাথেই কত কিছু হয়, তাই বলে সবাইকে কি বিয়ে করতে হবে নাকি? মোহভঙ্গ হ'ল তরুণীর, ঠিক করল

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মা গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়েই সব জ্বালা জুড়োবে। এদিকে সাঁতার না জানা মানুষ জলের সামনে এসে ঘাবড়ে গিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে করতেই আশেপাশের লোকের নজরে এল সে। তারপর স্বদেশ মালাকারের হাতে বন্দি হয়ে থানায় হাজিরা। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার করিয়ে এই মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠাতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। কোয়ার্টারে ফিরে ভবানীবাবু গিন্নীকে বললেন এই তরুণীর কথা। কত অসহিষ্ণু আজকালকার ছেলে মেয়েরা, চটপট কিছু একটা করে বসতে এরা দু'বার ভাবে না। ভবানী মনে মনে ভাবেন, তিনি মায়ের কথা মতো একবারও চোখের দেখাটুকুও না দেখে বেলারানীকে বিয়ে করেছিলেন। পঁচিশ বছরের দাম্পত্যে অনেক ওঠাপড়া আছে কিন্তু কখনো মনে হয়নি মায়ের কথা মতো বিয়ে করে কোনো ভুল হয়েছে। বেলারানী আর ভবানীর এক মাত্র কন্যা, সদ্য একটি বহুজাতিকে চাকরি নিয়েছে, আপাতত বেঙ্গালুরুতে আছে। বেলারানী এসব শুনে মেয়ের জন্য চিন্তায় পড়ে যান। এযুগের ছেলেমেয়েরা বড্ড আবেগপ্রবন, কখন কী করে বসে কে জানে! বাপ-মায়ের নজরের বাইরে থাকলে কাঁচা বয়েসের ছেলেমেয়েরা এমনিতেই কিছুটা বেপরোয়া হয়ে যায়; মায়ের মন কথায় কথায় কু ডেকে ওঠে। অগত্যা গিন্নীকে আশ্বস্ত করেন ভবানী, "খামোখা দুশ্চিন্তা করে কি লাভ? আমাদের মেয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী আর ম্যাচিওরড, ভালো চাকরি করছে, অকারণ সাতপাঁচ ভেবে ভেবে নিজের প্রেশার বাড়িয়ে ফেলো না।"

এই বয়েসের ছেলেমেয়েদের সাথে খুব চটপট মিশে যান ভবানীবাবু। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের সাথে মানসিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে মনের বয়েসও বোধহয় নেমে আসে কয়েক ধাপ, সজীব হয়ে ওঠে মন, উন্মুক্ত হয়ে যায় ভাবনার পরিসর। ভবানীবাবুর চোখ চলে যায় বাঁ হাতের কব্জির ওপরে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকা সোনালি ব্যান্ডের রিষ্টওয়াচটার দিকে। মনে পড়ে যায় কত কথা, কত মূহূর্তেরা এসে ভীড় জমায় মনের আয়নায়। ধুলো ঢাকা আয়নার কাঁচ মুছলে যেভাবে পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে, সেই ভাবেই ফিকে হয়ে আসা স্মৃতিগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় বছর সাতেক আগের কথা। ভবানী সরকার তখন ভগবানপুর থানার বড়বাবু। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটি সুপ্রাচীন জনপদ ভগবানপুর এমনিতে শান্ত এলাকা। চোর বদমাশের উৎপাত সেভাবে নেই আবার রাজনৈতিক দিক থেকেও মোটামুটি স্থিতিশীল। থানার দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ভগবানপুর কলেজের ছাত্র-নির্বাচন ঘিরে একটা উত্তেজনা তৈরি হ'ল এলাকায়। দু'দিন ছাড়াছাড়া দু'দল ছাত্রর মধ্যে মারপিট লেগে যায় আর পুলিশ কোনোক্রমে মাঝখানে পড়ে সামাল দেয়। একদিন মারপিট কিছুটা লাগামছাড়া হয়ে উঠল আর দুই দলেরই বেশ কিছু ছাত্রকে আটক করল পুলিশ। থানায় ডাকা হ'ল ধরে নিয়ে আসা ছেলেদের বাবাদের। তারপর বকাঝকা করে মুচলেকা লিখিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল সবাইকে। মতীন্দ্র নারায়ণ ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের ছাত্র নেতা। কোনো মামলা মোকদ্দমা বিনে মুক্তি দেওয়ায় সে ভবানীবাবুকে বারে বারে কৃতজ্ঞতা জানাল আর কথা দিল কলেজে আর কোনোরকম ঝামেলা হবে না, অন্তত সে যতদিন নেতৃত্বে থাকবে। তারপর থেকে এই মতীন্দ্র নারায়ণ হয়ে উঠল ভবানীবাবুর খুব কাছের মানুষ। মতীন্দ্র তখন একুশ বাইশের তরতাজা যুবক, থার্ড ইয়ারের আউটগোয়িং ব্যাচ, ক্লাব আর বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নানা সামাজিক কাজে যুক্ত। ধীরে ধীরে ভবানীবাবুও ওদের সামাজিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়লেন। বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চ থেকে রাখী উৎসব পালন, ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে দীপাবলির দিন বাজির প্রদর্শনী, সব কিছুতেই বড়বাবু আর মতীন্দ্র নারায়ণ একসাথে। অসম বয়সী দু'জন মানুষের মধ্যে একটা প্রগাঢ় মানসিক বন্ধন গড়ে উঠল। ভগবানপুর থানা থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই কজলাগড় রাজবাড়ি। কোনো এক সময়ে জৌলুস ছিল বোঝা যায়। এখন শুধুই হাড়জিরজিরে চেহারার ধ্বংসাবশেষ। ছাদহীন বিশাল উঁচু প্রাসাদের দেওয়ালগুলো নির্বিকার সাক্ষী কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া আভিজাত্যের। বিশালাকার বটের অবাধ্য ডালপালা কঙ্কালসার দেওয়ালের শরীর ভেদ করে বিস্তার ঘটিয়েছে নিজের খেয়াল খুশি মতো। দাঁত বের করা ইটের দেওয়াল না বটের শরীর, কে কাকে আঁকড়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে বলা মুশকিল। রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ এই প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন বলে শোনা যায়। তার পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন অপুত্রক। শেষ পর্যন্ত তাঁর দত্তক পুত্রের হাতেই যায় রাজপাট। মতীন্দ্র নারায়ণ এই রাজবংশের সন্তান। সম্ভবত মহেন্দ্র নারায়ণের মেয়ের দিকের উত্তর পুরুষ। এখন যদিও সেসবের বালাই নেই। মতীন্দ্রর বাবা সরকারি স্কুলের মাষ্টারমশাই। তাঁর চলনে-বলনে কিছুটা বনেদিয়ানার ছাপ চোখে পড়লেও মতীন্দ্র নারায়ণ একেবারে বিপরীত মেরুর

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মানুষ। সামাজিক কাজকর্ম, ক্লাব, সংগঠন আর কিছুটা রাজনীতি নিয়ে ওর দিন যাপন। ভবানীবাবু মজা করে কখনো-সখনো রাজা নারায়ণ বলে ডাকতেন মতীন্দ্রকে। মতীন্দ্র হেসে বলত, "ওসব রাজা গজা কিছু নয় স্যার, জমিদার বা সামন্ত রাজা মতো ছিল এঁরা। সেসব ব্রিটিশ আমলের কথা, এখন ওই ভাঙ্গা বাড়িটার ক্ষয়ে যাওয়া ক'টা দেওয়াল ছাড়া আর তো কিছু নেই। আমি রাজা হতে যাব কেন?" ভবানীবাবুর কাছে ওই কাজলাগড় রাজবাড়ির গুরুত্ব অন্যরকমের ছিল। এর ঐতিহাসিক মূল্য তো ফেলে দেওয়ার নয়, কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া কত ঘটনার যে সাক্ষী ওই দেওয়ালগুলো, তা একমাত্র বোধহয় মহাকালই জানেন। তবে এই রাজবাড়ি বা তার ইতিহাস নিয়ে ছাপার অক্ষরে খুব কিছু পাওয়া যায় না। ভবানীবাবু মতীন্দ্র নারায়ণের কাছে শুনেছে, এই রাজারা নাকি বর্ধমানের রাজবংশের সাথে যুক্ত এবং সব জমিদারি যেভাবে শেষ হয়েছিল, এঁরাও তেমনই সমস্ত ধন সম্পত্তি ফুর্তি আর নেশার বশবর্তী হয়ে শেষ করেছিল। ভবানী সরকার ভগবানপুরে প্রায় বছর চারেক কাটিয়ে অন্যত্র বদলি হলেন কিন্তু ততদিনে তিনি ওই এলাকার মানুষের সাথে মনে প্রাণে জড়িয়ে গেছেন। বিশেষ করে মতীন্দ্র নারায়ণ যেন বন্ধু বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অনুভব করল ভবানী সরকারের বদলির নির্দেশে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভবানী সরকার ফেয়ারওয়েল নিয়েছিলেন সমাজের নানা স্তরের মানুষের কাছ থেকে। তিনি সমস্ত উপহার ফিরিয়ে শুধু ফুল নিয়েছিলেন। কেউ জোরাজুরি করলে বলেছিলেন, "আপনাদের যে ভালোবাসা পেলাম তার থেকে বড় গিফট আর কিছু হতেই পারে না। সামান্য সরকারি চাকুরে হয়েও যে এত মানুষকে আপন করে নিতে পেরেছি, এই তো বিরাট পাওনা। ভালো থাকবেন সবাই।" সবাইকে ফিরিয়ে দিলেও মতীন্দ্রকে কিছুতেই ফেরাতে পারলেন না তিনি, মতীন্দ্র কোনো যুক্তিই শুনতে চাইল না, "এটা আমি থানার বড় বাবুকে দিচ্ছি না, ছোট ভাই হিসেবে দাদাকে দিলে আপনার আপত্তির কারণ কি? যখনই এটা আপনার হাতে থাকবে, আমার কথা মনে পড়বে, ব্যস ওইটুকুই চাই।" ভবানী বাবু আর না করতে পারেননি, সোনালি ব্যান্ডের রিষ্ট ওয়াচটা যত্ন করে প্যাক করে নিয়েছিলেন অন্যান্য জিনিসের সাথে। মগরাতে বদলি হয়ে আসার কিছুদিন আগেই বেলারানী আলমারি থেকে ঘড়িটা বের করলেন। একাধিক ঘড়ির এমনিতে কোনো প্রয়োজন পড়েনি; আজকালকার কোয়ার্টজ ঘড়ি তো শুধু ব্যাটারি পাল্টে নিলেই বছরের পর বছর চলে যায়। তাছাড়া ঘড়ি নিয়ে আলাদা কোনো ফ্যাসিনেশানও নেই ভবানীবাবুর। তবু বেলারানী বললেন, "আছে যখন, পাল্টে পাল্টে পড়তে পারো, না পড়লে ঘড়ি ভালো থাকে না।" আজ বছর খানেক হ'ল, মতীন্দ্র নারায়ণের দেওয়া রিষ্ট ওয়াচ ভবানীবাবু হাতে বাঁধছেন। একদিন ফোনে কথা প্রসঙ্গে বলেও দিয়েছেন মতীন্দ্রকে, "হ্যাঁ রাজা, তোমার ঘড়ি কিন্তু পড়ছি যত্ন সহকারে।" সত্যি বলতে কী, আগের ঘড়িটা দেখতে একটু সেকেলেও ছিল, গোল ডায়ালের পুরোনো এইচএমটি মডেল। মতীন্দ্রর দেওয়া ঘড়িটা আধুনিক ডিজাইনের আর সোনালি ব্যান্ড হওয়ায় ভবানী বাবুর হাতে যেন মানিয়েছেও বেশ। সময় নিজের নিয়মেই পেরিয়ে যায় এক মূহুর্ত থেকে আরেক মূহুর্তে, দিন গড়িয়ে মাস আর মাস গড়িয়ে বছর কাটে জীবনকে পরিপূর্ণতায় ভরিয়ে দিয়ে।

পূবের আকাশে সবে হালকা রাঙা আলোর ঝলক ফুটে উঠেছে। ত্রিবেণী ঘাট এখন একদম জনশূন্য। আর কিছু সময় পরেই মানুষের আসা যাওয়া শুরু হয়ে যাবে। ভবানীবাবু গঙ্গার ধারে, ঘাট থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিছুটা দূরে আবছায়ায় হংসেশ্বরী মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। বহমান জলের স্রোতের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভবানীবাবু কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই তাঁর কর্ণগোচর হচ্ছে না। এই সেই তিন পবিত্র নদীর সঙ্গমস্থল। পৌরাণিক মতে এলাহাবাদের প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমের নাম যুক্তবেণী আর বাঁশবেরিয়ার কাছে ছোট্ট জনপদ ত্রিবেণীর এই সঙ্গম স্থলের নাম মুক্তবেণী। বোধহয় যমুনা আর সরস্বতী নদী গঙ্গার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এখানে, সেইজন্য এই ত্রিবেণী সঙ্গম মুক্তবেণী। তবে প্রয়াগে যেমন সরস্বতী অন্তঃসলীলা এখানে কিন্তু তেমন নয়। এখানে সরস্বতী অস্তিত্বহীন নয়। আড়াই-তিনশো বছর আগে সরস্বতীর নাব্যতা ছিল বড় নৌকা চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত। কাছের সপ্তগ্রাম বন্দর ছিল বিরাট বানিজ্যের কেন্দ্রস্থল। আজকের সরস্বতী তার জৌলুস হারিয়ে মজা খালে পরিণত, ওই রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের মতোই। সেই সপ্তগ্রামও আগের কৌলীন্য হারিয়েছে কালের নিয়মে। হুগলী জেলাকে পশ্চিমে আর উত্তর চব্বিশ পরগনাকে পুবে রেখে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে হুগলী নদী, ছলাৎ ছলাৎ শব্দে যেন কত কথা বলে চলেছে নিজের খেয়ালে। ভবানীবাবু ভোর হওয়ার আগেই উঠে এসেছিলেন, ভালো করে আলো ফোটার আগেই ফিরে যেতে হবে। হাত

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

থেকে সোনালি ব্যান্ডের ঘড়িটা খুলে একবার দেখলেন ভালো করে, ন'টা দশ বেজে বন্ধ হয়ে আছে। মনের ভিতরের উথাল পাথাল ভাবটা স্তিমিত হতে সময় লাগবে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভবানী, মুঠোয় ধরে থাকা ঘড়িটা ছুড়ে দিলেন নদীবক্ষে, তারপর পা বাড়ালেন কোয়ার্টারের দিকে।

গতকাল সকাল থেকেই ঝামেলা ছিল থানায়। জেলে পাড়ার ঘোষ পুকুরে কারা বিষ মিশিয়ে দেওয়ায় সমস্ত মাছ মরে ভেসে উঠেছে। ষোলোআনা কমিটির সদস্যদের নিজেদের ভিতরকার বিবাদ থেকেই এই সব কাণ্ড বলে পুলিশের খবর। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় গণ্ডগোল এড়ানো গেলেও পরিস্থিতি সামলাতে তিন জন সন্দেহজনক লোককে অ্যারেস্ট করা হ'ল। দফায় দফায় আলোচনা আর শান্তি মিটিং করতে হ'ল বিবাদমান গোষ্ঠীর লোকেদের নিয়ে। রাত পর্যন্ত পুলিশি টহল চলল গ্রামে। ভবানীবাবু থানা থেকে উঠলেন প্রায় রাত দশটার দিকে। ঠিক তখনই ভগবানপুর থানার এস আই রনবীর চন্দ ফোনে খবরটা দিল। ভবানী এমনিতেই সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত ছিলেন, খবরটা শুনে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন। মতীন্দ্র নারায়ণ রাতে এগরা থেকে টু হুইলারে বাড়ি ফেরার পথে এক্সিডেন্টে মারা গেছে। রাত সাড়ে ন'টার দিকে পুলিশের টহলদারি ভ্যান মতীন্দ্রকে রাস্তায় মৃত অবস্থায় দেখতে পায় এবং হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবুরা ওকে মৃত ঘোষণা করেন। সন্ধ্যের পর বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা পিছল ছিল, সম্ভবত চাকা স্কিড করেই এক্সিডেন্ট হয়েছে অথবা কোনো বড় গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়ে থাকতে পারে। রনবীর আরও কিছু বলে গেল কিন্তু ভবানীবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না, মাথা ঘুরে গেল, কপালের কাছে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল, ফোন ছেড়ে ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। কী আশ্চর্য, হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক ন'টা বেজে দশে। ভবানী সরকার এত বছরের চাকরি জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছেন, অনেক অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড দেখেছেন কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতি তাঁর সমস্ত চেতনা এক লহমায় নাড়িয়ে দিল। মতীন্দ্রর দেওয়া ঘড়িটা তার সাথে সাথেই থেমে গেছে যেন। ভবানী উঠলেন, কোয়ার্টারে ফিরে অবসন্ন শরীরটা বিছানায় ছুঁড়ে দিলেন, তার আগে ঘড়িটা খুলে টেবিলের এক পাশে রেখে দিলেন। এই ঘড়িটা সম্ভবত আর কখনো সঠিক সময় দিতে পারবে না। তীব্র যন্ত্রণাক্লিষ্ট মনের কোণ থেকে কিছু একটা উঠে এসে গলার কাছে আটকে আসছে মনে হ'ল। ভবানী ঠিক করলেন, ত্রিবেণী সঙ্গমেই মতীন্দ্রর শেষ স্মৃতিটুকু ভাসিয়ে দেবেন, মা গঙ্গার পবিত্র জলেই হয়ত ধুয়ে যাবে সমস্ত গ্লানি আর বিষণ্ণতা। ভারী হয়ে এল ভবানীবাবুর চোখের পাতা, ঝাপসা হ'ল দৃষ্টি।

প্রিয়ন্তে

অর্ঘ্য ভট্টাচার্য্য

শূন্যতা, তুমি নির্বিকার।
তোমার ঘোলাটে চাহনি,
ফ্যাকাশে ঠোঁটের নিস্তরঙ্গতায়
অনন্ত সময়ের টিকটিক।
এক পলক।

সকালের সূত্রপাতে মুছে যাওয়া রক্তিমতা,
মৃত্তিকাপাত্র ভেসে চলে যায় মোহনায়।
তারপরও থেকে যায় গন্ধ।

ডুব, ডুব, ডুব।
পুরাতন চিহ্নহীন দেহে,
ফেলে আসা সময়ের ক্ষত।
সময়ের নগ্ন-পথে চলে এগিয়ে।
নির্বিকার শূন্যতায়।
এক পা, দু'পা।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ঢেকির শাক

দেবদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম থেকে উঠতেই রুরুর ভিডিও কল এল, ও ওর কিচেন গার্ডেনে ঢেকির শাক লাগিয়েছিল। বেশ বড় সবুজ সবুজ কচি ঢেকির শাক লতপত করে ঘাড় নাড়ছে স্ক্রিন জুড়ে। দেখেই মন ভালো হয়ে গেল। গতবার রুরু আলু লাগিয়েছিল ওর ছোট্ট সবুজ বারান্দায়। আমায় চারটে গোল ফুলো ফুলো আলু পাঠিয়েছিল। আমার এই তিনশো এগারো তলার ফ্ল্যাটে একটা ছোট ব্যালকনি থাকলেও মাটির যা দাম বাগান আর করা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া ঐ প্রোটিন ভিটামিনের ব্যালেন্স ট্যাবলেট খেয়ে শেষ পঞ্চাশ বছর বেশ আছি। কোনো শরীর খারাপ বা উদ্বেগ নেই। রান্না বান্না ভুলতে বসেছি প্রায়। করতেও ইচ্ছা করে না। তাছাড়া মাটির মতো জলেরও প্রচুর দাম এখানে। তবে আজ ঐ লম্বা ঢেকির শাক দেখে বহুদিন পর ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। আমার মায়ের হাতের ঢেকির শাক অমৃত! সে স্বাদ যে একবার খেয়েছে সেই ভুলতে পারবে না। মায়ের হাতের সব রান্নাই অপূর্ব। মা এখনও মাঝে মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর সব পদ রান্না করে, তেল মশলা যে কোথায় পায় কে জানে! আমি আজ কত বছর এই তিনশো তলার নিচে যাই না, মাটির কাছে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। ওপরেই আমরা ভালো আছি। এখানে পলিউশন নেই।

রুরু আবার একটু অন্যরকম, কিছুটা আমার মায়ের ধারা পেয়েছে। মায়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব। মাকে নিয়ে ও ওল্ড সিটিতে যায় কী সব মশলার খোঁজে। মায়ের সঙ্গে নাতি-নাতনিদের সম্পর্ক বন্ধুর মতো। রুরুর এই কিচেন গার্ডেনের শখ ওর দিদুনকে দেখে। মায়ের একটা ছোট্ট ছাদ বাগান আছে। টমেটো, পালংশাক করেছিল গত মাসে। তবে আমার মেয়ে হয়ে রুরু যে কেন এতটা সেকেলে কে জানে!! আসলে ডিএনএর এফেক্ট এসব। আমায় ওর জন্মের আগে একটু ভাল করে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।

যাক গে, আজ আমাদের তিন বন্ধুর একটা গানের অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা, ছুটির দিন দু'একটা হলে এ ধরনের অনুষ্ঠান হয়। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে একটা জেটক্যাব বুক করলাম। পলিকে ফোন করলাম তুলে নেবো বলে। এথেনা আগেই পৌঁছে যাবে। অবশ্য বাড়িতে বসেও এসব দেখা যায়। কিন্তু আমরা একটু ঘুরব বলেই হলে যাই।

অনুষ্ঠান শেষে একটা এনার্জি শপে বসে তিনজনে গল্প করছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা ফুলদানীতে এক গোছা এসপ্যারাগাস শোভা পাচ্ছে। এথেনা দেখেই সেলফি তুলতে শুরু করে দিল। ও বয়সে আমাদের চেয়ে অনেকটাই ছোট, ও কখনো আসল গাছপালা দেখেনি। আসলে সবুজ পৃথিবীটা ওর জন্মের আগেই বড্ড যান্ত্রিক হয়ে গেছিল।

এথেনাদের প্রজন্ম নীল আকাশ দেখেনি, সমুদ্র দেখেনি। ফুলের বাগান দেখেনি। নতুন প্রযুক্তিতে সমুদ্রের জলের উপরেও ভাসমান বাড়ি তৈরি করেছে বিজ্ঞানিরা। তাই সব সমুদ্র ঢেকে গেছে। তাতে বাসস্থান সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। এই প্রজন্ম কৃত্তিম সুইমিংপুলে খেলে বড় হয়েছে। চারশো পাঁচশো তলার ছাদে কৃত্তিম বাগানে নকল ফুল, কৃত্তিম মেঘে ঢাকা রঙিন আকাশ দেখেই ওরা আনন্দ পায়। উপগ্রহ থেকে মেপে বৃষ্টিপাত হয় এখন, তার আগাম খবর থাকে। তখন ওরা বৃষ্টিতে ভেজে। এই পৃথিবীতেই ওরা নিরাপদ।

ওদের আমি রুরুর বাড়িতে ঢেকিরশাকের ছবি দেখাতেই এথেনা একবার ওখানে যেতে চাইল। আমি বললাম কথা বলে রাখব রুরুর সঙ্গে। পরে একদিন যাওয়া যাবে।

দুদিন পর এথেনা ফোন করেছিল আবার, আমি বেশ লজ্জিত হয়েই বললাম আজ রুরুকে ঠিক জিজ্ঞেস করবো। দুপুরে রুরুর ক্লাস থাকে। এখন সবাই অনলাইনেই পড়াশোনা করে। স্কুল ব্যাপারটা উঠে গেছে বহুদিন আগেই। দেওয়াল জোড়া স্ক্রিনের সামনে বসেই পড়ায় রুরু। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে ওর ছাত্রছাত্রীরা।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

বিকেলে রুরুকে ভিডিও কল করে ঢেকির শাকের কথা বলতেই ও কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে বলল -''আর বলো না, ঐ প্ল্যান্টটা নিয়ে যা কাণ্ড হল!''

আমি তো বেশ অবাক! ঢেকির শাক নিয়ে আবার কী হতে পারে!

-''তোমার মা, মানে দিদুন পরশু এসেছিল আমার বাড়ি। দিদুন আসলে কী দারুন সব রান্না করে জানো তো। কাল লাঞ্চে একটা দারুন টেস্টি সবুজ রঙের আইটেম বানিয়েছিল। একদম অন্যরকম খেতে, ইয়াম্মি। আমি তো একাই দু'হাতা ভাত খেয়ে ফেললাম। এবছর প্রথম ভাত খেলাম সেদিন। কী একটা রাইস দিদুন এনেছিল যেন।

আফটার লাঞ্চ বায়োসাইন্স ক্লাসে একটা প্রেজেন্টেশন ছিল ফার্ণের উপর। এত কষ্ট করে ওল্ড টাউন থেকে ঐ ফার্ণ সিড জোগাড় করে প্ল্যান্টটা বানিয়েছিলাম। ব্যালকনিতে গিয়ে আমার মাথায় হাত। গোড়া থেকে পরিপাটি করে গাছগুলোকে কেটে নিয়েছে কেউ!

আমার চিৎকারে দিদুন একটা পান ট্যাবলেট চুষতে চুষতে এসে বলল, 'চিৎকার করছিস কেন? ডেসিবেল ক্রস করলে এক্ষুনি সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ ছুটে আসবে!'

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে ফাঁকা টব দেখাতেই দিদুন কী বলল জানো! আমার প্রোজেক্টের ফার্ণ ততক্ষণে আমাদের পেটে। অবশ্য ফ্রিজে রান্না করা আরেক বাটি রাখা ছিল ডিনারের জন্য। ঐ কচি ফার্ণগুলো দিয়েই দিদুন ঐ স্পেশাল ডিসটা বানিয়েছিল।''

আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছিলাম না। রুরু তো আগে কখনো ঢেকির শাক খায়নি। ও কী করে জানবে ঐ শাকের মাহাত্ম্য! আমি ওকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বললাম -''তা ফ্রিজে কি এখনো রয়েছে ঐ স্পেশাল ডিস? রাতে তবে তোর বাড়ি আসছি আজ!''

অলঙ্করণঃ ঋদ্ধায়ন দাস

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

একটি সাধারণ ঘটনা অথবা একজন বিরল পাখি

সুমন সানা

এক:

গতকাল রাতে দেখা স্বপ্নের যে-ক'টা দৃশ্য মনে পড়ছিল বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছিল এক-এক করে। বেনু চোখ খুলে শুয়ে আছে বিছানায়। আজ আর তেমন জ্বর নেই কিন্তু সে কি ছাদের দরজার কাছে যাওয়ার অনুমতি পাবে! তবু একবার যাবে সে। শুধু দেখে আসবে স্বপ্নে দেখা পাখির বাসা নীল সোনালি পাখি আর একটা সাদা বড় ডিম কি সত্যি আছে ছাদের দরজার উপর গর্ত জায়গাটায়। এমন সাদা ডিম বা এমন পাখি সেলিম আলীর বইতে কি আছে! ক্লাস টেনের দাদা-দিদিদের যখন বাবা পড়ায় তখন সে জেনেছিল সেলিম আলীর কথা। বইটা সে চোখে দেখেনি। সেলিমের কোনো রঙিন ছবিও দেখেনি সে। কেবল কল্পনা করে। আর পেন্সিল স্কেচ যে ছবিটা পায় সেখানে দেখে একজন লোক লুঙ্গি পড়ে হাতে দূরবীন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বাড়ির ভেতর ছোট বাগানে। আম গাছের উপর চোখ রাখছে। তার হাতের দূরবীন বেনুরটার মতোই। আর পায়ের হাওয়াই চটি বাবারটা। যখন বাবা পড়াতে বসেন তখন জুতোজোড়া পরবার সুযোগ পায় সেলিম। আর তাড়াহুড়ো করে পাখি-টাখি দেখে এসে রেখে যায় বাবা জানতে পারার আগেই।

এই সমস্ত পাড়া আগে গাছপালায় ভর্তি ছিল। সবারই নিজের বাড়ি ছিল। এখন সব ফ্ল্যাট বাড়ি। গাছও নেই পাখিও নেই। কেবলমাত্র বেনুদের বাড়িটাই বেঁচে আছে তার পাঁচ কাঠা কলেবর আর আম-জাম-কাঁঠাল-গোলাপ যখন-যেমন ফুল গাছ নিয়ে। এছাড়াও শামুক আছে, জোঁক আছে, কেন্নো আছে, মশাও আছে। বেনুদের বাড়ি অথবা ল্যাংটা বাড়ি। বেনুর-ই মনে মনে দেয়া নাম। একতলা কমপ্লিট নেই, দোতলায় বাস। মনে হয় প্যান্ট নেই শুধু জামা পরা। একবার স্কুলে যা হয়েছিল সেসব লজ্জার কথা না বলাই ভালো।

তবে বাড়ি আর কতদিন থাকবে শোভনবাবু নিজেও জানেন না। প্রোমোটার এ-পাড়ার শেষ চিহ্নটুকু রাখতে চান না আর, এতটাই পারফেকশনিস্ট। বাকিসব ফ্ল্যাটবাড়ির মাঝে কেমন যেন একটা দেখায়। চল্লিশ লাখ-দুটো 3bhk-সেকেন্ড ফ্লোর অফার আছে।

এইটুকু জায়গা ছেড়ে দিন শর্মাজি, সারা জীবন অনেক কিছু লড়াই করে ওইটুকুই আমার নিজের বলে দাবি করতে পারে। ওটা আর কারো সাথে শেয়ার করতে পারব না। আমার ইমোশনটাও একটু বুঝুন...

শর্মা শুধু বলেছিল পঞ্চাশ করতে পারি।

-নাহ শর্মাজি, টাকার জন্য....

-আপনি আসুন। শর্মা শেষ কথা বলে।

আজকাল ল্যাংটা বাড়ির ল্যাংটা অংশে তাস পেটায় কিছু নতুন লোক। গত পরশু ওরা মদও খেয়েছিল, শোভনবাবু দু-একটা দরজায় ঘুরলেও লাভ হয় নি। আর সামান্য ব্যাপারে পুলিশের নাক গলানোর সময়ই-বা কোথায় তবে চল্লিশ পার করা শোভনের জেদ আঠারোর মতোই। তিনি কাঁটাতারে ঘিরে দিলেন ল্যাংটা বাড়ি, গেট বসিয়ে দিলেন তা প্রায় মাসখানেক হবে।

বেনু ঘুমিয়ে পড়ে আবার। শরীরে জ্বর না থাকলেও মুখের তেতো স্বাদ, হাত পায়ের অবশ অবস্থা আর তৃষ্ণা নিয়ে ঘুমিয়েই পড়ে বেনু। তিনটে ডিম তিনজন হাতে নিয়ে ডানা ঝাপটাতে থাকল। রাহুল-কুশল-রবি ডানা ঝাপটাতে থাকল, স্বপ্নে জ্বর মেশানো ঘুমের ভেতরেই।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

দুই:

দিন সাতেক পরে বেনু যখন ছাদে ওঠে, প্রথমেই সে খোঁজে পাখির বাসা, আর সেই আশ্চর্য ডিমটা - স্বপ্নের পাখি, স্বপ্নের বাসা, সাদা নীল মায়াবি ডিম কিছুই নেই। মন খারাপ করছে স্বাভাবিক কারণেই। তাদের বাড়ির দোতলার ছাদ থেকে পাশের বাড়ির ঋষভদের জানালা দেখা যায়। ঋষভদা বাবার কাছে পড়তে আসে। ঘরেও সে পড়ে। ওই জানালার পাশে বসে নিউটনের সূত্র, ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র, সেলফিশ জায়ান্ট, আবার মারিও খেলে, ভিডিও গেম। বেনুর কানে গেমের আওয়াজটা বাজতে থাকে। মারিও লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে, মারিও কাসেলের কাছে পৌঁছে গেল, মারিও খাদে। পাখির আওয়াজ চারিদিকে। এপাড়ায় এটাই এদের শেষ আশ্রয়। কিছু পাখির নাম বেনু জানে। কাক ডাকছে। কাকের কথাই মনে পড়ছে আপাতত। কা-কা-কা-বেনু-বেনু-বেনু-কা-কা-কা --- এই বেনু এই।

মা ডাকছে লুচি-বেগুন ভাজা আর সুজির থালা হাতে। ছাদে দাঁড়িয়েই বেনু খাচ্ছে। মা খাইয়ে দিচ্ছে। গলা দিয়ে খাবার নামছে আর পাশের বাড়ির ঋষভদা ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র পড়ছে। কিছু বছর পর যখন বেনু ল্যাবে ব্যাঙ কাটবে তখন সে প্রথম ক্লোরোফর্মের গন্ধ পাবে; সাথে ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের আঁশটে গন্ধ। দূর থেকে খোল-করতাল-হরিবোল শোনা যাচ্ছে। আওয়াজটা ধীরে ধীরে বেনুদের গলির ভেতর থেকে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। বেনুর মা রাস্তায় উঁকি মেরে দেখছেন। বেনু নেচে নেচে লুচি খেতে লাগল। লুচির থালা ঝনঝনিয়ে ওঠে । হরিবোল-খোল আর অন্তমিলে খিস্তি শোনা যাচ্ছে তালে তালে। ছাঁদের পাচিল ধরে উঁকি মারে বেনু; পা উঁচু করে। তার বাবা আসছে। কোমর অব্দি জামা কেটে ছোট করা। পুরুষাঙ্গ উন্মোচিত। ল্যাংটা বাড়ির ল্যাংটা মালিক আসছে। পিছনে মদখোর-তাসপেটানো লোকগুলো। নবলব্ধ ব্যালকনি থেকে দেখছে সবাই। হাসছে কেউ কেউ ।

মেরা বাপ চোর হ্যা...অমিতাভ বচ্চন... লুচিঠাসা মুখে বিড় বিড় করে ওঠে বেনু ।

তিন:

অনেক ডাকাডাকি করেছিল স্ত্রী শোভন ওইভাবেই বসেছিল নীচতলায়। ল্যাংটা বাড়ির ল্যাংটা মালিক, বসে যাওয়া সাদা বালির উপর, পা ছড়িয়ে বসে ছিল। পাড়া চুপচাপ ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। অনেক রাতে শোভন উঠে আসে দোতলায়। ভালো করে স্নান করে। পেট ভরে ভাত খায়। ঘুমন্ত ছেলের মাথায় হাত বুলায়। ক্রন্দনরত স্ত্রীকে সাহস জোগায়। হেরে যাবার মানুষ শোভন নন। তবুও কিছুদিন পর অতি গুরুত্বপূর্ণ কেস পেয়ে বাড়িতে পুলিশ আসে শোভনবাবুর বডি নামাতে।

- বড্ড ভালো লোক ছিলেন স্যার আমাদের ...

-কেন যে এমন করলেন!

-আর মানুষের মন কখন যে কি ভাবে!

ইত্যাদি শতাব্দী প্রাচীন কথাবার্তা চলতে থাকে ভিড়ের মধ্যে যেমন চলে থাকে আর কী! সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত শোভনবাবু নিজে থেকেই নেমে এলেন গলার দড়ি আলগা করে স্ত্রীকে, পুত্রকে শেষবার দেখে নিলেন অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার আগে। বেনুর দিকে তাকালেন। দূর থেকে বেনু দেখল বাবা অ্যাম্বুলেন্সের সিটে মুখ ঢেকে পড়াচ্ছেন, বাকিরা বই হাতে পড়ছে - these are the wounds of love....these are the wounds of love...জমি ছেড়ো না বেনু... জমি ছেড়ো না ... অ্যাম্বুলেন্স চলে যাচ্ছে দূরে কিন্তু বেনুর কানে ফিসফিস করে কথাগুলো বলে চলেছে বাবা। বেনু ভয় পায়। তার কানের কাছ থেকে ঘাড়ের উপর ভারী ভারী লাগছে। বেনুর জ্বর আসবে আবার। এরপর অনেক বছর কেটে যাবে।

আকাশে একটা বিরাট ত্রিভুজ এঁকেছেন ভূপতি স্যার। ত্রিভুজের সাথে চেইন দিয়ে আটকানো ওদের বাড়ি। মাটির নীচ থেকে অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠছে আগুনের শিখা। টাইট টাইট গেঞ্জি থেকে ভুঁড়ি বের করে নাচ করছে মদখোর-তাস পেটানো

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

লোকগুলো; আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে my name is Anthony Gonsalves গানের তালে তালে। গোলগাল ফর্সা লোকটা বাবাকে পেরেক ঠুকে আটকে দিচ্ছে ত্রিভুজের তিন কোণে। সোনালী ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসছে বেনু। নীল-সোনালি পাখি হয়ে শর্মাকে ঠোকরাচ্ছে। খসে যাচ্ছে তার পালক আবার গজাচ্ছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করছে সে। কা-কা-কা।

বেনুদের বাড়ি এখন জি-প্লাস-সিক্স ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। রাস্তার নাম পাল্টে ডি. ডি. শর্মা লেন হয়েছে। বেনু আর মা থাকে একটায়। দরজার তলা থেকে খাবার দিয়ে যায় মা; ওষুধ দিয়ে যায়। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করিয়ে দেয় লোক ডেকে। মাঝে মাঝে তারা ভাঙ্গা ডিম আর পাখির দু-একটা খসা-পালক পায় ঘরের ভেতর থেকে।

২১ শে ফেব্রুয়ারী

স্নেহাশিস দত্ত চৌধুরী

১|| আমার ভাষায় আকাশে জেগেছে আলো
রাত মুছে ফেলে জেগে থাকা অভিমান,
একটা সকালে আমার ভাষার গানে
ভৈরবী সুরে তিস্তায় লাগে টান।

২|| আবু, অনামিকা - দু'জন দু'দেশে থাকে
হৃদয়ের আলো জ্বালে এক ভাষাতেই,
পদ্মার ঢেউ তোর্সাকে ছুঁতে এলে
কাঁটাতার রোখে এমন সাধ্য নেই!

৩|| যদিও যুবক ঠিকানা জানে না, তবু
ভালোবাসা লেখে, কথার পাহাড় হয়।
শব্দেরা তার আবেগের রঙ চেনে
ভাষা মানে শুধু নিছক আখর নয়।

৪|| রেডিওতে শুনি ফেব্রুয়ারীর গানে
ও-দেশে সবাই গাইছে ভাষার জয়,
ভাষা যেন মা'র গলার স্বরের মতো
শুনে জেগে উঠি, একটা সকাল হয়।

ডাস্টবিনের আত্মকথা

সুমনা মিত্র

আমি হতভাগ্য এক ডাস্টবিন
ঠায় দাঁড়িয়ে রাস্তার মোড়ে,
নিদারুণ ঝড়, বৃষ্টি, তাপ, দূষণ
কুয়াশা ঘেরা শীতের ভোরে।

নিষ্পাপ শিশু আমার বুকে ভাসে
সমাজের দূষিত পাপে,
আমার নেই আলিঙ্গন ক্ষমতা কোনো
হৃদয়খানি বড়ো কাঁপে।

কতগুলো কুকুর আসে আমার কাছে
খাবারের মামলায় মাতে,
মাঝে মাঝে লড়াইয়ের অংশীদার হয়
কতিপয় মানুষের হাতে।

ইউস মি লেখা আছে আমার গায়ে
যেন নিখুঁত ভাবে ঠাসা,
অপরাধের সূত্র লোপাট করতে আমি
ভীষণ রকমভাবে খাসা।

দুর্গন্ধ মেখে, আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে
দেখি সভ্যতার ঠুনকো রূপ,
অভাগা, দুর্ভাগ্য বয়ে জড় বস্তু তাই
চিরদিনের মতো চুপ!

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল

রৌহিন

প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি এই দুঃসময় পেরিয়ে সকলে ভালো আছ। আমরা গত তিনটি সংখ্যা ধরে যে আলোচনা করেছি, তা-ও আশা করি তোমাদের মনে আছে। কারণ আমরা আমাদের এরকম অনেক কঠিন কঠিন দুঃসময় এবং সুসময় নিয়েও আলোচনা করছিলাম – শূন্য থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি – সেখান থেকে এই সৌরজগৎ, পৃথিবী নামে একটা অকিঞ্চিৎকর গ্রহ – তারপর সেখানে প্রাণ নামক এক অঘটন – সেখান থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একদল বাঁদরের গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসা, তারপর হোমো নামক জেনাসের কয়েকটি প্রাণী – যাদের শেষ জীবিত বংশধর হোমো-স্যাপিয়েন্সের আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আজকের দিনে এসে পৌঁছানোর কাহিনী – এই আমরা বলে চলেছি ধারাবাহিকভাবে। সময়রেখাটা যেহেতু কয়েক হাজার কোটি বছরের – সেজন্য তাল রাখতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমরা লাফ মেরেছি এই টাইমলাইনের বিভিন্ন প্রান্তে – কখনো এক লাফে এগিয়ে গেছি হাজার কোটি বছর, কখনো বা লক্ষ লক্ষ বছর, কখনো কয়েক হাজার বছর। মাঝের ফাঁকগুলো পূরণ হবে কী করে? হতে পারে যদি তোমরা চাও – তাহলে ফিরে ফিরে যাবে, সেই ফাঁকের সময়ে কী হয়েছিল, দেখার, বোঝার চেষ্টা করবে। একটা বই পড়লে তাতে পাবে আরও দশটা বইয়ের সূত্র – সেগুলি পড়তে পড়তে আরও সূত্র – যেখানে যেতে চাও, যেতে পারো সেখানেই, যদি ইচ্ছে করো। কারণ একমাত্র আমরাই এটা পারি – হোমো স্যাপিয়েন্সই গোটা বিশ্বজগতে এখনো অবধি জ্ঞাত একমাত্র জীব যার জানার ইচ্ছা বলে একটা বস্তু আছে। তো আজ আমরা এই 'জানার ইচ্ছে', বা বলা যায় হোমো স্যাপিয়ান্সের আর যা যা এরকম স্পেশাল ব্যাপার আছে, সেসব নিয়ে একটু কথা বলি – কেমন?

গতবারের আলোচনা আমরা শুরু করেছিলাম আজ থেকে মোটামুটি দশ হাজার বছর আগের সময়ে – যখন আমরা প্রথম শিকারী-সংগ্রাহকের জীবন ছেড়ে কৃষিকাজের দিকে ঝুঁকলাম। ধান, গম এবং ভুট্টা – এই তিন ধরণের ঘাস, আর গরু, ছাগল, মুরগি, শুয়োরের মতো কিছু পশুকে (ঘোড়া আরও কিছুকাল পরে আসবে) পোষ মানাতে শিখলাম। ইতিহাসের বইয়ের হিসাবে সেই সময়টাকে আমরা বলি নতুন প্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক এরা। দশ হাজার বছর আগে জীবনযাত্রার ধরণের সেই আমূল পরিবর্তনকে আমরা বলি কৃষিভিত্তিক বিপ্লব। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা এটাও আলোচনা করেছিলাম, যে কৃষিভিত্তিক বিপ্লব হয়ত ততটাও কিছু 'বিপ্লব' ছিল না – বরং তা আমাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানকে তার আগের তুলনায় খারাপের দিকেই নিয়ে গেছিল। হ্যাঁ, অল্প কিছু মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটেছিল, তাই তাদের কাছে এটা বিপ্লব। আর তারাই যেহেতু তারপর থেকে ইতিহাসের দায় নিয়ে এসেছেন, তাই সেই বিপ্লবের মাহাত্ম্য আমাদের সকলের কাছেই পৌঁছেছে। আমরা ভাবতে শিখেছি যে আমরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব এবং আমাদের জন্যই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তৈরী এবং উৎসর্গীকৃত হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর ভাবনার ফলাফল হয়ত খুব দ্রুতই আমাদের হাতেও আসবে। কিন্তু আজকের আলোচনার বিষয় সেটা নয়। আজ বরং আমরা একটু ফিরে দেখব – সিনেমার ভাষায় যাকে বলি 'ফ্ল্যাশব্যাক' – সেরকমই আর কি। ফিরে যাব অনেকটা – আজ থেকে প্রায় দুই লক্ষ বছর আগে।

দুই লক্ষ বছর কেন? কারণ যদিও পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ লক্ষ (মতান্তরে এক কোটি) বছর আগে গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসা এক দল মহাকপি শেষ অবধি পরিবর্তিত হয়ে 'হোমো' নামক জেনাস (বর্গ) টির উদ্ভব ঘটেছিল, কিন্তু তাদের নানান স্পিসিস (গণ)-এর মধ্যে সর্বশেষ এবং আজ অবধি টিঁকে থাকা একমাত্র প্রজাতি, হোমো-স্যাপিয়েন্সের উৎপত্তি এই সময়েই – অর্থাৎ আজ থেকে দুই লক্ষ বছর আগে। বর্তমান পূর্ব আফ্রিকায়। এই 'হোমো-স্যাপিয়েন্স' নামটি লক্ষ্য করার মতো – হোমো মানে যদি আমরা সমস্ত মানুষ বর্গকে ধরি, তাহলে স্যাপিয়েন্স হ'ল আমাদের গণ – আজকের মানুষ, স্যাপিয়েন্স। এবং মজার কথা, ল্যাটিনে এই স্যাপিয়েন্স শব্দের অর্থ হ'ল

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ওয়াইজ বা জ্ঞানী। মানে, আমরা নিজেরাই নিজেদের নাম দিয়েছি, 'জ্ঞানী মানুষ'। কারণ আমরা মনে করি, বিশ্বাস করি যে আমরাই 'শ্রেষ্ঠ' জীব। বাকিরা এলেবেলে। ঠিক যেমন একসময়ে আমাদের ইউরোপীয়ান প্রভুরা মনে করতেন, আমাদের তুলনায় তারা মানুষ হিসাবে শ্রেষ্ঠ, তাদের সেবা করার জন্যই আমাদের জন্ম। কিন্তু আমরা জানি, সেটা সত্যিই তেমনটি ছিল না – সেসবই নানান জটিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমীকরণের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু সে সব তো ইতিহাসের উপাদান – আমাদের আজকের আলোচ্য তো ইতিহাস নয়, প্রাগৈতিহাস। মাত্র দুই লক্ষ বছর আগে উদ্ভূত হওয়া এক অকিঞ্চিৎকর সাধারণ জীবের থেকে আজকের পৃথিবীর শাসক হবার অনতিদীর্ঘ যাত্রাপথের উপাদানগুলি।

হ্যাঁ, আজ থেকে দুই লক্ষ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্স ছিল অত্যন্ত সাধারণ একটি জীব মাত্র – পৃথিবীর রাজা হবার কোনো সম্ভাবনাই তার মধ্যে তখন দেখা যায়নি। দৌড়, পেশীশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, সাঁতারপটুতা, গাছে চড়ার ক্ষমতা – সবেতেই সে অ্যাভারেজ – সেরা পঞ্চাশটা জীবের তালিকায় কোনোদিনই নেই। হ্যাঁ, তোমরা বলতেই পারো যে, তাদের তো ব্রেন ছিল। এটা ঠিক, যে দুই লক্ষ বছর আগের একজন স্যাপিয়েন্সের ব্রেনের মাপ আর আইনস্টাইনের ব্রেনের মাপ মোটামুটি একই ছিল – থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি আবিষ্কার করার ক্ষমতা তখনই ছিল সে যুগের আইনস্টাইনের। এবং সে ক্ষমতা অন্য প্রায় কোনো জীবেরই ছিল না – একজন বাদে। সে হ'ল আমাদের সর্বশেষ বিলুপ্ত জ্ঞাতি ভাই – হোমো নিয়েন্ডারথালস। হ্যাঁ, তাদের ব্রেন আমাদের মতন তো বটেই, সত্যি বলতে কি, আকারে আমাদের চেয়েও বড় ছিল। কিন্তু, তা তাদের বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেনি। সত্যি বলতে কি, তাদের সেই বিলোপে আমাদের, অর্থাৎ তাদের জ্ঞাতি ভাই স্যাপিয়েন্সদের যথেষ্টই হাত ছিল। সেসবে পরে আসব। কিন্তু আপাততঃ দেখা যাচ্ছে, তাহলে মস্তিষ্কের মাপ একই হলেও, তখনকার সময়ে অন্ততঃ সেটার বাড়তি সুবিধে বিশেষ কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। বরং উলটে, এই বিশাল মাপের মস্তিষ্ক আমাদের অসুবিধাই করছিল। কারণ যত বড় যন্ত্র, তার চাই তত বেশী জ্বালানী। এই বিরাট মাপের মস্তিষ্ককে চালু রাখতে চাই প্রচুর রক্ত সঞ্চালন – ফলে হৃদপিণ্ড যে পরিমাণ রক্ত পাম্প করে, তার বেশীটাই ব্যবহার হয়ে যায় মস্তিষ্ককে সচল রাখতে। অগত্যা আমাদের শরীরের বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ছোট হতে শুরু করল – শিম্পাঞ্জি মায়ের মতো হাঁটু অবধি লম্বা হাতের বদলে আমাদের হাত কোমর ছাড়িয়ে আরেকটু মাত্র। আঙুল ছোট। শরীরের পেশী ছোট। এবং অন্ত্রের মাপ ছোট – ফলে কমলো হজম করার ক্ষমতা। পরিবর্তিত হ'ল খাদ্যতালিকা। সত্যি বলতে কি, আফ্রিকার সেই গহন অরণ্যে, যেখানে একমাত্র নিয়ম হল "সারভাইভাল অফ দা ফিটেস্ট" বা "যোগ্যতমের উদবর্তন", সেখানে এই ব্রেনকে গুরুত্ব দিয়ে বাকি শরীরকে দুর্বল রাখা স্ট্র্যাটেজি হিসাবে অত্যন্ত খারাপ। কারণ যদিও সবচেয়ে বুদ্ধিমান শিম্পাঞ্জিটাও সবচেয়ে বোকা মানুষটাকে তর্কে কোনোদিনই হারাতে পারবে না, কিন্তু সেসব শেষ করে সে এক টানে মানুষটাকে দু'টুকরো করে ফেলতে পারবে সহজেই।

এসব অবশ্য হোমো-স্যাপিয়েন্সের একার সমস্যা নয় – হোমো গোষ্ঠীর সব প্রাণীই কমবেশী এই সমস্যার শিকার। এর একটা সমাধানও অবশ্য তারা করে নিয়েছিল – সেও হোমো স্যাপিয়েন্সরা পৃথিবীতে আসার প্রায় এক লক্ষ বছর আগে থেকেই – সেটা হল, রান্না করা। আগুনের সঙ্গে হোমো গোষ্ঠীর পরিচয় আজ থেকে প্রায় আট লক্ষ বছর আগে থেকেই – কিন্তু নিয়মিত আগুন ব্যবহার, খাদ্যবস্তু আগুনে পুড়িয়ে সহজপাচ্য করে নেওয়া – এর শুরু মোটামুটি তিন লক্ষ বছর আগে থেকেই। ফলে স্যাপিয়েন্সরা প্রায় প্রথম থেকেই এই আগুনের ব্যবহার জানত। আগুনে রান্না করার ফলে তাদের অন্ত্রের ওপর চাপ কম পড়ত, ফলে ছোট অন্ত্র এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গ তাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছিল। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও তারা তখনও নেহাৎ-ই আরও একটি টিকে থাকা জীবের বেশী কিছু ছিল না। আমরা তাদেরকেও শিকারী-সংগ্রাহক হিসাবেই উল্লেখ করি বটে, কিন্তু তাতে 'শিকারী' অংশটা অনেকটাই গৌরবে। হ্যাঁ, শিকার সব মানুষ প্রজাতিই (হোমো জেনাস) করত বটে, দলবদ্ধভাবে, কিন্তু অস্ত্র বলতে যেহেতু শুধুই বিভিন্ন আকারের পাথর, ফলে সেই শিকার পুরো দলের পক্ষে যথেষ্ট হতো না, বলাই বাহুল্য। তাহলে তাদের খাবার জুটত কিভাবে? অবশ্যই মূলতঃ সংগ্রহের মাধ্যমে – ফলমূল, বীজ, শিকড়, পোকামাকড়, এবং – হ্যাঁ, অস্থিমজ্জা – অর্থাৎ হাড়ের ভিতরের অংশ। হ্যাঁ, অস্থিমজ্জা ছিল সেই আদিম

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মানুষদের প্রধান প্রোটিনের উৎস। বাঘ, সিংহের মতো বড় জীবেরা কোনো বড় পশু (হরিণ, সম্বার, মহিষ, হাতি, ম্যামথ) শিকার করলে তার মাংস খেতো যতটা পারত। তাদের খাওয়া হয়ে গেলে আসত শেয়াল, হায়নার মতো ক্যারিয়ন বা উচ্ছিষ্টভোগীরা। তারাও খেয়ে চলে যাবার পর সেই উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট, পড়ে থাকা হাড়গোড় খেতে আসত মানুষ – বিভিন্ন প্রজাতির। আর হ্যাঁ, ছোটখাটো প্রাণী শিকার করত তারা সুযোগ পেলে – কিন্তু সে সুযোগ আসত কমই – প্রায় সবার শিকার হয়ে গেলে যেটুকু বাঁচত আর কি। মনে রাখতে হবে, গৃহপালিত জীব কিন্তু তখন ছিলই না কারো – কারণ, এক তো গৃহই ছিল না, দুই, অন্য পশুকে পোষ মানানোর কথা মাথাতেও আসেনি কারুর। প্রথম যে পশু মানুষের পোষ মানে, খানিকটা নিজের স্বার্থেই, সে হ'ল কুকুর – কিন্তু সে অনেক পরের কথা – আজ থেকে খুব বেশী হলে পনেরো হাজার বছর আগে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য-শৃঙ্খলেও আমরা বেশ নীচের দিকে, মাঝামাঝি শ্রেণীর একটা জীব ছিলাম সেই দুই লক্ষ বছর আগেও। আমাদের একটা বড় আকারের মস্তিষ্ক থাকলেও তা সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশী করছিল। কিন্তু তাহলে কী এমন ঘটল হঠাৎ, যার ফলে এই নিতান্ত সাধারণ, ধর্তব্যের মধ্যেই না থাকা একটা জীবগোষ্ঠী হঠাৎ করেই পৃথিবীর শাসক হয়ে উঠল – তাও মহাজগতের অন্যান্য ঘটনাক্রমের সাথে তুলনা করলে একেবারে উল্কার গতিতে? এই বিষয়টা বোঝার জন্য আমাদের এবার সময়রেখা ধরে আবার একটা ছোট লাফ মারতে হবে – এবার সামনের দিকে। দু'লক্ষ বছর আগে আবির্ভূত স্যাপিয়েন্সের জীবন ধরে আরও এক লক্ষ তিরিশ হাজার বছর মত এগিয়ে আসব আমরা – অর্থাৎ আজ থেকে মোটামুটি সত্তর হাজার বছর আগে। কিন্তু তার আগে ছোট্ট করে বলে নিই, এরও তিরিশ হাজার বছর আগে, মানে আজ থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে, আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। তার বহু আগে, এমনকি স্যাপিয়েন্সদের আবির্ভাবেরও অনেক আগে হোমোদের অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতি আফ্রিকা ছেড়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল – যেমন মিশর দিয়ে আমাদের এই ভারতবর্ষ – ব্রহ্মদেশ – ইন্দোনেশিয়া – মালয় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল হোমো ইরেকটাস নামে একটি প্রজাতি – আবার ইউরোপ, মধ্য এশিয়ায় ছিল হোমো নিয়েন্ডারথালরা। তো এই এক লক্ষ বছর আগে, স্যাপিয়েন্সদের একটা দলও আফ্রিকার বাইরে এসে বসতি করতে চেয়েছিল। মধ্য এশিয়ার লেভান্ত (গত সংখ্যায় যার কথা বলেছিলাম, চাষবাসের সূচনা হয়েছিল যে অঞ্চলে) অঞ্চলে স্যাপিয়েন্সদের সাথে নিয়েন্ডারথালদের দেখা হয়। এই অঞ্চলের দখল নিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষও হয় – মজার কথা হ'ল, এই যুদ্ধে স্যাপিয়েন্সরা যাকে বলে গো-হারা হেরেছিল এবং আবার আফ্রিকায় পালিয়ে গেছিল। পূর্ব ইউরোপেও সেই একই কাণ্ড ঘটে। পরবর্তী তিরিশ হাজার বছর স্যাপিয়েন্সরা আর আফ্রিকা থেকে বেরোবার চেষ্টা করেনি। তিরিশ হাজার বছর পরে যখন বেরোলো, তখন কিন্তু গল্পটা পালটে গেল। কিন্তু কিভাবে? কী ঘটেছিল এই সময়ে, যা তিরিশ হাজার বছর আগের থেকে আলাদা? কী ঘটেছিল, যার ফলে শুরু হয়েছিল এই সত্তর হাজার বছরব্যাপী দৌড় – যেখানে অন্য হোমো জেনাসরা তো বটেই, প্রাণজগতের রথী-মহারথীদের পিছনে ফেলে এই অকিঞ্চিৎকর জীবটি, হোমো-স্যাপিয়েন্স চলে এলো যোজন যোজন দূরে – পৃথিবীর একছত্র শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারল নিজেকে? সত্তর হাজার বছর আগের সেই সময়কে ঐতিহাসিকেরা চিহ্নিত করেছেন বিশ্বজগতের প্রথম বিপ্লব হিসাবে – বৌদ্ধিক বিপ্লব বা কগনিটিভ রেভোলিউশন। যা আমাদের আলাদা করে দিয়েছে অন্য সকলের থেকে – দিয়েছে ভাবার ক্ষমতা। এত লক্ষ বছর ধরে যে মস্তিষ্ককে আমরা বয়ে এসেছি অকারণ বোঝার মতো, সে আমাদের প্রতিদান দেওয়া শুরু করল, এই সময় থেকেই।

কিন্তু সেসব কিছু হঠাৎ করে হয়ে যায়নি নিশ্চই – যে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মানুষেরা দেখল, তারা সকলে দারুণ বুদ্ধিমান হয়ে গেছে, এই বর্শা আবিষ্কার করছে তো এই চাকা, আজ তীর ধনুক তো কাল ঢাল তরোয়াল – এরকম তো নয়। তাই আমরা এবার বোঝার চেষ্টা করব, এই বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব আসলে কি, কেমন করেই বা তা বদলে দিলো এত লক্ষ বছরের সমস্ত হিসাব-নিকাশ। বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উপাদান থেকে তখনকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পেয়েছি, তা হ'ল, স্যাপিয়েন্স সহ হোমো জেনাসের সব গোষ্ঠীই মোটামুটি ছোট ছোট দলে বাস করত এবং একসাথে শিকার করত – আর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শিকারের সন্ধানে এবং ভালো ফলমূলের

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। শুধু তারাই নয়, শিম্পাঞ্জী, গোরিলার মতো তাদের নিকটাত্মীয়েরা, বানরেরা, এমন কি মহিষ বা বন্য কুকুরেরাও এরকমই দলবদ্ধভাবে থাকত। কিন্তু শারিরীকভাবে এই মাপের প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে কমজোরী হওয়ায় স্যাপিয়েন্সকে এই দলবদ্ধতার ওপর ভরসা করতে হতো অনেক বেশী। শুধু খাদ্যের বাঁটোয়ারা নয়, শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, একজনের বিপদে আরেকজনের সহায়তা, এসবেও তাদের পরস্পরকে প্রয়োজন হতো। কিন্তু তা সত্বেও, এ তাদের মৌলিক ক্ষমতা ছিল না – যেমন আগেও বলেছি, অন্যান্য মানুষ গোষ্ঠী এবং আরও বেশ কিছু প্রাণী এরকম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু এই সময়ে, স্যাপিয়েন্স গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এমন কিছু ঘটতে লাগল, যা অন্য কোনো প্রাণীগোষ্ঠীতে, এমনকি হোমো জেনাসের অন্য গোষ্ঠীতেও দেখা যায়নি। সেটা কি জানো বন্ধুরা? শুনলে অবাক হয়ো না – সেটা হ'ল, গল্পগুজব – আরও সঙ্কীর্ণ করে বললে, পরনিন্দা পরচর্চা। মজার ব্যাপার, তাই না?

এই বিষয়টা বুঝতে হলে আমাদের গোষ্ঠীর নিয়মকানুন, একটা গোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব কিভাবে কাজ করে – এগুলো একটু ছোট করে বুঝে নেওয়া দরকার। গোষ্ঠী মানেই তাতে থাকবে একজন গোষ্ঠীপতি বা নেতা বা মোড়ল। সাধারণতঃ দলের মধ্যে যে সবথেকে শক্তিশালী, সে-ই হয় গোষ্ঠীপতি – যদিও এর কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায় কোথাও কোথাও – যেমন গোরিলারা অনেক সময়েই সবচেয়ে কেয়ারিং গোরিলাটিকে দলপতি বাছে – তার থেকে শক্তিশালী কেউ থাকলেও তারা তাকেই মেনে নেয়। আবার অনেকে, যেমন রাজহাঁসেরা, দলপতি বাছে তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে, তাকেই। অন্য কেউ দলপতি হতে চাইলে তাকে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে বর্তমান দলপতিকে হারিয়ে দেখাতে হয়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাকে কেউ ভালো বা মন্দ বলতে যায় না। অর্থাৎ এক কথায়, নৈতিক বিচারের কোনো ব্যবস্থা এসবের মধ্যে নেই – ছিলনা, ওই সময়ের আগে পর্যন্ত – ওই সত্তর হাজার বছর আগে, স্যাপিয়েন্সদের মধ্যে প্রথম এলো এইসব নৈতিক বিচারের বোধ। অর্থাৎ তাদের দলপতি হতে শুধুমাত্র সবচেয়ে শক্তিশালী বা সবচেয়ে বিবেচক হওয়াই আর যথেষ্ট হচ্ছিল না এই সময় থেকে – একই সঙ্গে তাকে একাধিক গুণের অধিকারী হওয়া জরুরী হয়ে পড়ছিল। শক্তিশালী, বিবেচক, প্রেমিক, সুদর্শন – এরকম নানান বিষয়ে তাকে বিচার করে তবেই দলপতি করা যেত। শুধু দলপতিই নয়, অন্যদের মধ্যেও এসব গুণাগুণ – অর্থাৎ এক কথায় কে ভালো, কে খারাপ, এসবের বিচার শুরু হ'ল। এর একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফল ফলতে শুরু করল।

সাধারণভাবে, বানর, শিম্পাঞ্জী বা গোরিলাদের যে সব দল আমরা দেখি, তাতে কমবেশী ১৫/২০জন থেকে আরম্ভ করে ৫০/৬০জন সদস্য থাকতে পারে। হোমো-স্যাপিয়েন্স সহ বিভিন্ন প্রজাতির মানুষও এরকমই ছোট ছোট দলে থাকত। কিন্তু এই সময় থেকে, পারস্পরিক আলোচনা, দু'জন বা বেশ কিছু মানুষের একত্রে একজন অনুপস্থিত মানুষ সম্বন্ধে চর্চা – এগুলির ফলে স্যাপিয়েন্সরা দলে ভারী হতে শুরু করল। শুধু দলপতির গায়ের জোর নয়, তার বিভিন্ন গুণে বিভিন্ন লোক আকর্ষিত হ'ল – এমন কি কেউ দলপতি না হলেও, তার কোনো নির্দিষ্ট গুণের কারণে অন্য কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল – এরকমও ঘটা সম্ভব। এখন তোমরা প্রশ্ন করতেই পারো যে এসব যে ঘটেছিল, তা ইতিহাসবিদেরা বা বৈজ্ঞানিকেরা কী দেখে সিদ্ধান্ত করতে পারছেন? এই প্রশ্নের উত্তরটি একটু জটিল – প্রথমতঃ, এই সময় থেকেই স্যাপিয়েন্সরা যে বড় বড় দলে থাকত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের অস্থায়ী বসতিগুলির চেহারা, ব্যবহৃত জিনিষের পরিমাণ, বর্জ্যের পরিমাণ ইত্যাদি দেখে। কিন্তু তাদের এই বড় দল হওয়ার পিছনে আসল কারণ যে পারস্পরিক গল্পগুজব, পরচর্চা ইত্যাদি – এটা অনুমান করার পথটা এত সহজ নয়। সে জন্য প্যালেন্টোলজিস্টদের খুঁজে পাওয়া কিছু সামগ্রী, যা ভাষা সৃষ্টির ওই বিশেষ সময়টিকে চিহ্নিত করে, রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এরকম নানান উপাদানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছানো গেছে। এই লেখার শেষে আমরা কিছু বইয়ের নাম দেবো – যেগুলি পড়লে এই 'কিভাবে জানা গেল' সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা আরেকটু পরিষ্কার হতে পারে।

তাহলে যেখানে ছিলাম, দেখা গেল, এই নৈতিক বিচার এবং পরচর্চার কারণে স্যাপিয়েন্সরা দলে ভারী হতে শুরু করল অন্যদের তুলনায় – কিন্তু তারও একটা সীমা ছিল। এই পরচর্চাই হোক আর আরেকজনকে কোনো কারণে ভালো লাগা

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ইত্যাদি – এসবের ফলে কত মানুষ এক জায়গায়, এক দলে দীর্ঘদিন থাকতে পারে? খুব হিসাব করে দেখা গেছে, সেই সংখ্যাটা ওই ৫০/৬০এর চেয়ে অনেক বেশী হলেও খুব বিশাল কিছু নয় – মেরেকেটে ১৫০ জনের মতো। স্যাপিয়েন্সদের দলগুলিও প্রাথমিকভাবে ওই ১৫০র আশেপাশেই হতো। যদিও ৫০জন নিয়েন্ডারথালের সাথে যুদ্ধে ১৫০জন স্যাপিয়েন্সের জেতারই কথা, তাদের ব্যক্তিগত শক্তি বা বুদ্ধি একটু আধটু কম হলেও। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'ল না। এই নৈতিক বিচার এবং পরচর্চার হাত ধরেই স্যাপিয়েন্সরা আরও একটা জিনিস শিখল বা বলা ভালো ঘষে মেজে নিল – সেটা হচ্ছে, মিথ্যা বলা।

এইবারে তোমরা সবাই মিলে আমাকে মারতে আসতেই পারো যে, মিথ্যা কী করে সভ্যতার উন্নতির হাতিয়ার হতে পারে? কিন্তু তার আগে ভেবে দেখো, মিথ্যে শুধু তো ক্ষতি করতেই বলা হয়, এমন নয়, ধরো আমরা ঠাকুমা-দিদার কাছে যে রাজপুত্তুর, পক্ষীরাজের গল্প শুনি, কিম্বা বড় বড় লেখকেরা কতকিছু লেখেন – সেসবও তো আদতে মিথ্যাই। আসলে মিথ্যা বহুবিধ – কল্পনাও তার মধ্যে পড়ে। এবং যদি ভেবে দেখি, এই কল্পনাশক্তিই, বা আরও সহজ কথায়, যা নেই, তাকে মনে মনে তৈরী করার শক্তিই সেই অনন্য ক্ষমতা, যা একমাত্র স্যাপিয়েন্স ছাড়া অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী বা অন্য কোনো প্রাণীর নেই। কিন্তু সে না হয় হ'ল – কিন্তু এই মিথ্যা বলা বা কল্পনা করার ক্ষমতা কী এমন বিশেষ, যে তা আমাদের একেবারে লাস্টের আগের বেঞ্চ থেকে সোজা ফার্স্ট বেঞ্চও টপকে মাস্টারের টেবিলে উঠিয়ে দিলো? সেই বিশেষ ব্যাপারটা হচ্ছে, যা নেই, তার অস্তিত্ব কল্পনা করা, নিজে বিশ্বাস করা এবং আরও পাঁচজনকে বিশ্বাস করানো। এটা না হলে, সম্পূর্ণ অচেনা দুটি স্যাপিয়েন্স কোনোদিনই একে অন্যের সহায়তায় এগিয়ে আসত না। তোমরাই ভেবে দেখো, নেপালি জং বাহাদুর রাণা, মারাঠি শ্রীকান্ত তুম্বলে আর বাঙালি বিশ্বজিত বারুই, যারা কেউ কাউকে কোনোদিন দেখেনি, একই যুদ্ধে নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পরস্পরকে বাঁচানোর চেষ্টা করত কখনো, যদি-না তারা তিনজনেই 'ভারত' নামক এক রাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত? অথচ সেই সত্তর হাজার বছর আগে তো সত্যিই আর ভারত বলে কোনো ভুখণ্ড আলাদা করে ছিল না – পৃথিবীর একটা অংশে একটা কল্পিত ভুখণ্ড টেনে তাকে ভারত কিম্বা ইংল্যান্ড কিম্বা রাশিয়া এসব নাম আমরাই দিয়েছি। সেই নামও পালটে গেছে কত সময়ে – সেই সীমানাও। তবু আমরা সেই আমাদের তৈরী করা রাষ্ট্রের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে যুদ্ধে নেমেছি।

তো মজাটা হ'ল এখানেই যে, যখন মানুষ আপাত অস্তিত্বহীন কোনোকিছুর কল্পনাকে নিজের থেকে অনেক বড় কিছু হিসাবে দেখাতে পারে, তখন তার ছাতার তলায় অনেক মানুষের একত্র হওয়া সহজ হয়। তারা পরস্পরের সম্বন্ধে ভালো-মন্দ যা-ই ভাবুক, তারা তাদের চেনা-জানা হোক বা না-হোক, কোনো এক বৃহত্তর বিশ্বাস, যা তারা সবাই বিশ্বাস করে, তার জন্য তারা পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়ে লড়ে যেতে পারে। তাই নিয়েন্ডারথালদের চল্লিশ, পঞ্চাশজনের দলের বিরুদ্ধে কখনো পাঁচশো স্যাপিয়েন্সের সেনাও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় – ফলে তারা যে এই লড়াইগুলো নিশ্চিত জিতবে, তা তখনই লেখা হয়ে যায়। কথাপ্রসঙ্গে জেনে রাখা যাক, মানুষের ইতিহাসে প্রথম ঈশ্বর উপাসনার নিমিত্ত তৈরী মূর্তি, যার শরীরটা মানুষের এবং মুখটা সিংহের, যা দেখে বোঝা যায় যে এটি সম্পূর্ণই কল্পনাপ্রসূত, এই সময়কালেরই সাক্ষ্য বহন করছে। অর্থাৎ মোটামুটি এই সত্তর হাজার বছর আগের বৌদ্ধিক বিপ্লবই ঈশ্বরের জন্ম দিয়েছিল, একথাও আমরা একরকম বলতে পারি। এবং এসবের ফলে স্যাপিয়েন্স যেমন চড়তে শুরু করল খাদ্যশৃঙ্খলের মাথায়, তেমনই পালটে যেতে লাগল তাদের অবস্থান। পরবর্তী ষাট হাজার বছরে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল, আগামীর পৃথিবীর শাসক কারা হবে। মহাকালের হিসাবে, এত দ্রুতগতির উত্থানের ইতিহাস অন্য কোনো প্রাণীর নেই। এরপর আমরা সে সব নিয়েও কখনো আলোচনা করব, কেমন, বন্ধুরা?

ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সকলে।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

তথ্যসূত্রঃ (কিছু মূল বইয়ের সূত্র দিলাম – যারা পড়তে চাও, এ বিষয়ে অসংখ্য বই আছে, প্রতিটাতেও আরও অনেক বইয়ের নাম দেওয়া আছে)

The Paleobiology of Australopithecus - Kaye E. Reed, John G. Fleagle and Richard E. Leakey

Brain Energy Metabolism: Focus on Astrocyte-Neuron Metabolic Cooperation - Mireille Bélanger, Igor Allaman and Pierre J. Magistretti

How Did Homo Sapiens Evolve? - Julia Galway-Witham and Chris Stringer

Grooming, Gossip, and the Evolution of Language - Robin Dunbar

Sapiens – Y N Harari

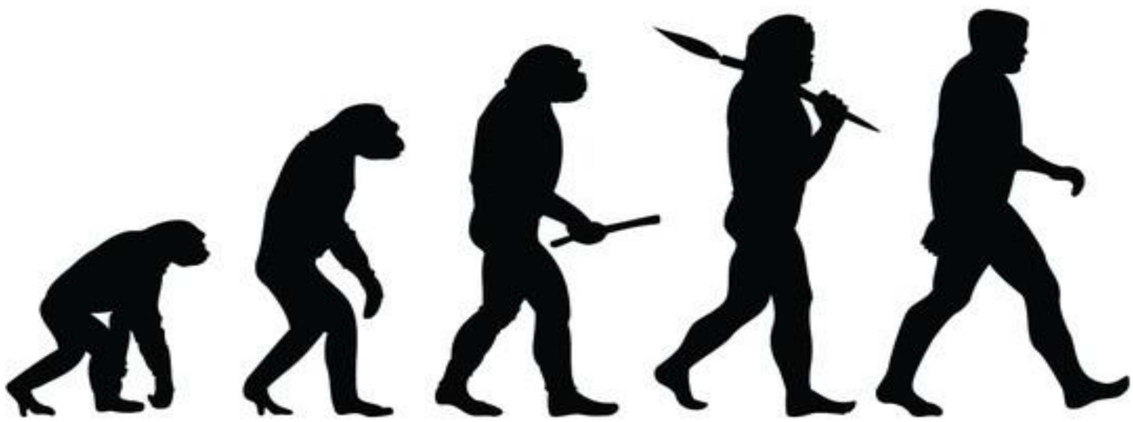

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ভার্সান

সঞ্জয়

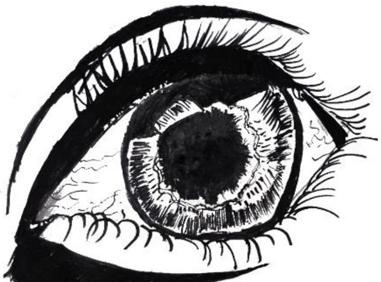

অলঙ্করণঃ ঋত্বিক দাসগুপ্ত

প্রায় বছর তিরিশেক পর কলেজের বন্ধুদের সাথে দেখা। সারাদিন গল্প, আড্ডা, স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসা - এসব করতে করতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। একটা রিসোর্ট বুক করা হয়েছিল বেশ নির্জনতার মাঝে যেখানে শুধু আমরা , মানে কলেজের বন্ধুরা ছিলাম দিনভর। প্রায় বছর পঁচিশ পর কলেজের বন্ধুরা একসাথে।

সারাদিন আড্ডা আর হুল্লোর। কিভাবে যে দিনটা কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। ডিনার শেষ করে যখন বের হলাম, রাত তখন প্রায় দশটা। সারাদিনই আকাশের মুখ ভার ছিল। তবে সারাদিন বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখন বের হচ্ছি, তখন শুরু হ'ল বৃষ্টি। ধীরে ধীরে সে তার বেগ বাড়িয়ে চললো। বৃষ্টি যতই হোক, বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়িতে অপেক্ষা করছে সুলগ্না অনেক প্রশ্ন নিয়ে। তাই বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে।

গাড়িটা নতুন। দিন দশেক হ'ল কিনেছি। আগের গাড়িটা বেশ রপ্ত ছিল। এটা একটু অন্যরকম। অনেক আধুনিক। অনেক বিষয় স্বয়ংক্রিয়। ঠিক সড়গড় হয়নি এখনো। তবে সেসব চিন্তা ছেড়ে গভীর রাতে হাইওয়ে দিয়ে একা একা রওনা দিলাম।

বৃষ্টি ক্রমশ তার গতি বাড়িয়ে প্রবল রূপ নিয়েছে। ওয়াইপার ব্লেডের অবস্থা ২৫শে ডিসেম্বরে পার্ক স্ট্রিটের ট্রাফিক পুলিশের মতো। এদিক সামলাতে ওদিক ভরে যাচ্ছে। কাঁচে বৃষ্টির ধারা যেন একটা জলের পর্দা টানিয়ে দিয়েছে। এমনিতেই আমি রাতকানা, তাই ঠাওর করতে পারছিলাম না কিছুই। হঠাৎ মনে পড়লো, এই গাড়িটা নাকি বেশ খানিকটা নিজে নিজে চলতে পারে। মানে আর্টিফিসিয়াল বুদ্ধি আছে এটাতে।

এই আর্টিফিশিয়াল শব্দটার সাথে আমার সখ্যতা খুব একটা নেই। পৃথিবীর কোনো আর্টিফিশিয়াল বিষয়কেই আমি কখনো পছন্দ করে উঠতে পারিনি। তাই ওসব থেকে দূরেই থাকি। আর সেই কারণেই হয়ত আমার বন্ধু কম। সমাজে আমার তেমন নাম নেই। আমার না আছে কৃত্রিম হাসি, না আছে কৃত্রিম কান্না। কাউকে অকারণে জড়িয়ে উল্লসিত হতে পারি না।

এই হ'ল সমস্যা। একটা কথা বলতে গিয়ে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। অকারণে সালভাদরের ছবিতে গনেশ পাইনকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। যাক, ফিরে আসি সেই গাড়ির আর্টিফিশিয়াল বুদ্ধির কথায়।

আমি এখনো গাড়ির ওইসব বোতামে হাত দিইনি কখনো যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করে। বয়সের সাথে সাথে মনে রাখবার ক্ষমতাও অনেকটা কমে যায়। স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে যতটুকু হয়, তা দিয়েই গাড়ি চালাই। ঠিক কোন বোতামে কি কাজ আর তা কখন ব্যবহার করতে হবে, সে পারমুটেশন-কম্বিনেশন নিয়ে একটুও ভাবিনি।

যাই হোক, আন্দাজের ওপর একটা সবুজ বোতাম টিপে দিলাম। টিপ দিতেই এক কিন্নরকন্ঠীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো

- হ্যালো, হ্যালো, মে আই হেল্প ইউ?

- এই মেয়ে, তুমি বাংলা বলতে পারো?

- একটু একটু।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

- কিভাবে শিখলে?

- ওই, আমার ডাটাবেসে যা দিয়ে দিয়েছে ততটুকুই। তবে ওটা বেশি নেই। যতটুকু আছে, তা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারবো আশা করি। তুমি চিন্তিত হয়ো না একটুও। আমি তোমাকে সবরকম সাহায্য করবো।

- ওটুকু বিদ্যে নিয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করবে? তবে বাকিটা শিখে নাও না কেন?

- সে তো আমার হাতে নেই। আমায় যা শেখানো হবে, আমি ততটুকুই শিখবো। তবে তুমি আমায় শেখাতে পারো, দেখবে খুব তাড়াতাড়ি আমি শিখে যাবো।

- তুমি আর কোন কোন ভাষা জানো?

- আমি তিনটে ভাষা ১০০% জানি, যেমন, ইংরেজি - আই লাভ ইউ, ফ্রেঞ্চ - je t'aime আর জাপানিজ - সুকি দা। সাথে জার্মান...

- এই, এ্যতো বেশি কথা বলতে হবে না, ভালবাসা-টালোবাসা তো নয়-ই! রাত-দুপুরে ঝুম বৃষ্টিতে গাড়ি চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। তার ওপর সাহায্য করবে বলে এসব শোনাচ্ছে।

- উমম!

বেশ কিছুক্ষণ একটা পেলব নীরবতা সারা গাড়ি জুড়ে।

- আহা, রাগ করলে? আচ্ছা তোমার নাম কী?

- আমার ডিফল্ট নাম সুজেন, তবে তুমি ইচ্ছে করলে আমায় অন্য যেকোনো নাম দিতে পারো।

- OK, how about Broti?

- নো নো নো, কেমন ব্র্যাট ব্র্যাট শোনায়।

- তুমি তো এর অর্থটা জানো না, জানলে হয়ত ভালো লাগতো।

- অর্থটা বলে দাও, আমি টুকে রাখবো।

- না, সেটার প্রয়োজন নেই। তুমি পরে ভুল করে আমার স্ত্রীকে বলে দেবে।

- সুলগ্নাকে? ওনাকে আমি চিনি।

- চেনো! কীভাবে?

- আমি তো ওনারই গাড়িতে আছি। তুমি ওনার ড্রাইভার নাকি সারভেন্ট?

- কোনোটাই নয়। আমি সুলগ্নার স্বামী।

- ও, তাই বুঝি।

- হ্যাঁ। তাই তোমার সাথে আর ওসব ব্রতী-টতি নিয়ে কথা বলা যাবে না।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

- আরে, তা নয়। প্রমিস করছি, বলবো না।

- দেখো, সুলগ্না আমাকে ভীষন ভালোবাসে। সে এতো রাতেও ঠিক জেগে আছে আমার ঘরে ফেরবার অপেক্ষায়।

- জানি। হয়তো বুঝিও। তবে তুমি কতটুকু বোঝো জানি না। আমি আর্টিফিশিয়াল হতে পারি যে কারণে তুমি আমায় পছন্দ করো না। কিন্তু আমার বাইরেও আর্টিফিশিয়াল অনেক কিছু আছে যা তোমাকে জড়িয়ে আছে।

- মানে! কি বলতে চাইছো?

- সুলগ্না সব জানে তোমার বিষয়ে। সে তো তোমার ওনাকে শাকচুন্নি বলে, আমি জানি।

সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল। এভাবে সোজাসুজি সত্যি কথাগুলো শুনবো, তাও একটা আর্টিফিশিয়াল বুদ্ধির কাছ থেকে, ভাবতে পারিনি। নিজেকে গুছিয়ে নিতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল।

- আরে, কী হল? চুপ করে গেলে কেন? আর, গাড়ির স্পিড একটু কমিয়ে নাও।

- আরে রাখো ওইসব কথা। বরং আমি আগে অন্য একটা নাম দিই তোমার, ময়ূরাক্ষী - অর্থ পিকক আইড মেইডেন। তোমার তো আবার নিশ্চয় অনেকগুলো নীল নীল ক্যামেরা আছে। সেগুলো দিয়ে তুমি দেখতে পাও, তাই তুমি ময়ূরাক্ষী।

- জানি, গুগল করে পেলাম, ময়ূরাক্ষী তুমি দিলে, নীল অন্ধকার কমলা নদী, টুকে রাখছি আমার মেমোরিতে। এই-এই তুমি বাম লেনে চলে যাচ্ছো, তিন ডিগ্রি ডান দিকে ঘোরাও তোমার স্টিয়ারিং। দাঁড়াও, আমি নিজেই ঘুরিয়ে দিচ্ছি। একটু সরো তো।

আমি তখন তুমুল অন্ধকারে শ্রাবণের ঘোরে। ওয়াইপার বৃষ্টির সাথে তাল রাখতে পারছে না। কিচ্ছু দেখছি না। মনে হল আমার নতুন গাড়িটার সমগ্র চেম্বারটা কাতান গন্ধে ভরে গেল। কোনো এক মোহিনী নারী একটু হেলে স্টীয়ারিং হুইলে আমার হাতে হাত রেখেছে। অতিকায় পাতা-কাঁটা খোঁপায় তার সাম্বাক জেসমিন গুচ্ছ! গাড়িটা অটোমেটিক, সে ঠিক লেনে ঘুরিয়ে আনলো, কিন্তু পেছনে দেখলাম হাইওয়ে পেট্রল (পুলিশ) লাল নীল বাতি। আমি বললাম, এই ময়ূরাক্ষী নাকি সুজেন তোমার যে নামই হোক, আমার ঘাড় থেকে নামো, পুলিশ অফিসার সাব ভিজতে ভিজতে আসছেন, আমার দফা রফা করে দেবেন, আচ্ছা, বলতো কোন বাটনটা টিপ দিলে তোমাকে বিদায় দেওয়া যায়?

- উমম - নো নো, আমি হ্যান্ডল করবো সমস্যাটা, বরং বলো কোন বোতামটা টিপ দিলে আমাকে আরো রোমান্টিক বানাতে পারো। তুমি নিজে মনে হয় খুব রোমান্টিক, না হয় কেউ ময়ূরাক্ষী নাম দেয়?

- হায় ভগবান, আমি কোথায় যাবো একে নিয়ে! আরে বোতামের কথা ছাড়ো। পুলিশ সাহেবের ধরবার আগে গাড়িটা থামাও।

কথাটা কানে গেল ময়ুরাক্ষীর। নিজেই ব্যবস্থা করে গাড়িটা সাইডে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

পুলিশ সাহেব পিছু ছাড়েননি। সামনে এসে দাঁড়ালেন। জানালার কাঁচ নামাতে বললেন। হয়ত ভেবেছিলেন মাতাল হয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। কিন্তু সব দেখে বুঝলেন আমি মাতাল নই। আমি জানালাম, বৃষ্টির জন্য গাড়ি চালাতে অসুবিধে হচ্ছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাই গাড়িটা লেন থেকে সরে গিয়েছিল।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

পুলিশ সাহেব কী বুঝলেন জানি না। পুরো গাড়িতে নজর বুলিয়ে নিয়ে বললেন- ঠিক আছে, আজ ছেড়ে দিচ্ছি। সাবধানে গাড়ি চালাবেন।

কোনোক্রমে প্রাণ ফিরে পেলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, ময়ূরাক্ষী কোথায়? চারিদিকে নিস্তব্ধতা। শুধু বৃষ্টির আওয়াজ। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। এ বোতাম সে বোতাম- চাপ দিলাম। না, কোনো সাড়া নেই।

তাহলে কী ময়ূরাক্ষী চলে গেল? হয়ত আমিই কিছু বলেছি যে কারণে সে চলে গেল। হঠাৎ ময়ূরাক্ষীর আওয়াজ শোনা গেল-

- কী হ'ল, দাঁড়িয়ে গেলে কেন? রাস্তার মাঝখানে এভাবে দাঁড়ালে অন্যদের অসুবিধে হবে যে!

- তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমি এতক্ষণ ধরে খুঁজছি তোমাকে!

- কোথাও যাইনি। নিজেকে রিসেট করে নিলাম নতুন ভার্সানের সাথে। এবার আমি আরো অনেক কিছু বুঝতে পারবো। নতুন অনেক কিছু শিখলাম।

- যেমন?

- এই যেমন ধরো- "ভাসিয়ে দেবার প্রবণতা প্রকৃতির ভেতর আছে। সে জোছনা দিয়ে ভাসিয়ে দেয়, বৃষ্টি দিয়ে ভাসিয়ে দেয়, তুষারপাত দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। আবার প্রবল প্রেম, প্রবল বেদনা দিয়েও তার সৃষ্টজগৎকে ভাসিয়ে দেয়।"

যাক, এখন ওসব থাক। এসব এখন বলতে বসলে রাত কেটে যাবে। যখন যেমন প্রয়োজন হবে তখন বুঝে যাবে। এখন গাড়িটা রাস্তার সাইডে করো।

- বুঝলাম। বেশ, আমি নিজেই গাড়িটা সাইড করছি।

- এই তো সুন্দর সাইড করে ফেললে। তোমার আর বেশিক্ষণ কষ্ট হবে না। বৃষ্টি এখনি কমে যাবে।

- তুমি বুঝলে কীভাবে?

- ওই যে বললাম, নতুন ভার্সান। এবার আমার কাজ শেষ। বৃষ্টি কমলে তুমি নিজেই গাড়িটা চালাতে পারবে। আমাকে আর প্রয়োজন হবে না। আর আমি থাকলে তোমার কথা বলতে অসুবিধে হবে। আমি না হয় অন্য কোনো সময় তোমার সাথে থেকে নিজেকে আরও রোমান্টিক করে নেবো। আজ আসি।

- কেন? কিসের কথা? কার সাথে? ময়ূরাক্ষী, ময়ূরাক্ষী....

ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমে এলো। এবার যাওয়া যাবে। তবে ময়ূরাক্ষীর কথা বারবার মনে আসছিল। পৌঁছতে তো হবে। তাই আবার স্টার্ট দিলাম গাড়ি।

এবারের পথটা চেনা। তাই অসুবিধে হচ্ছিল না। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। নিশ্চয় সুলগ্না ফোন করেছে। অনেকটা রাত হ'ল। চিন্তা করছে হয়ত। কিন্তু নম্বরটা তো চেনা নয়!

এক হাতে গাড়ি চালাতে চালাতেই ফোনটা রিসিভ করলাম।

- হ্যালো, হ্যালো। কে বলছেন? আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। একটু জোরে বলুন।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

বোঝা যাচ্ছিল ওপারে কেউ রয়েছে, তবে কথা বলছে না। অনেকবার হ্যালো, হ্যালো বলবার পর একটা আওয়াজ ভেসে এলো-

- আপনি কি আদিল?

- হ্যাঁ, আপনি কে বলবেন প্লিজ?

- আমি জুঁই।

- জুঁই! মানে-

হঠাৎ বৃষ্টি যেন প্রবলভাবে বেগ বাড়িয়ে নিল। সব কেমন আবার আবছা হয়ে যেতে লাগলো। আর কোনো বোতাম খুঁজে পেলাম না নিজেকে সামলাবার জন্য।

গল্পে এমনই এক হুবহু আষাঢ়, অযাচিত বৃষ্টি, আর কেউ ভিজতে চাইছে, যেন অবুঝ কিশোরী কোনো ?

তোমাকে ভুলতে চেয়ে

সঞ্চিতা ভট্টাচার্য

তোমাকে ভুলতে চেয়ে সব আয়োজন যখন শেষ,
ঠিক তক্ষুনি
তুমুল আড়ম্বরে তুমি পাশে এসে বসো।
কানের কাছে ঠোঁট ছুঁইয়ে ফিসফিসিয়ে বলো
প্রত্যেকদিন ভোরে ঘুম ভেঙে
হাতের পাতায় খোঁজো কার নাম?
তিরতির করে কেঁপে উঠি আমি
ধরা পড়ে গেলাম বুঝি?
আমি যে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি
আমার হাতের সে দাগ
ঠিক যেখানে শেষবার ঠোঁট ছুঁইয়েছিলে তুমি।
ও হাতে জল ছুঁইনি কতোদিন।
তোমাকে উড়িয়ে দিয়েছি যে হাত দিয়ে
ঠিক সেখানেই লুকিয়ে রেখেছি
তোমার কনক স্পর্শ।
ধরা পড়ে গেলাম বুঝি?
তোমাকে ভুলতে চাওয়াই
আসলে তোমাকে মনে রাখার সাড়ম্বর আয়োজন।

অলঙ্করণঃ বিট্টু রায়

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মহাভারতের অর্জুন

ঊষা রঞ্জন পোদ্দার

(তৃতীয় পান্ডব অর্জুন সুপুরুষ, বীর, যোদ্ধা, ধর্মানুরাগী, ভাতৃবৎসল ও প্রেমিক।
তার জীবন-কাহিনীর উপর কিছু আলোকপাত)

(১)

হস্তিনাপুর রাজ্য:

উত্তর ভারতে হস্তিনাপুর রাজ্য। রাজা শান্তনু। প্রথম পুত্র ভীষ্ম। ভীষ্ম পিতার কারণে রাজা হবেন না, বিবাহও করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শান্তনুর অপর দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। দুই জনেই অপুত্রক অবস্থায় অসময়ে মারা যান। রাজ্যরক্ষা ও বংশরক্ষার কারণে বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নীদ্বয় অম্বা ও অম্বালিকা গুরুজনদের ইচ্ছায় মহর্ষি ব্যাসদেবের সহযোগে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করেন। অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র বড় তবে জন্ম থেকেই অন্ধ। অম্বালিকার পুত্র পান্ডু। নাবালক ভাইদের অভিভাবক হিসাবে ভীষ্ম রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পান্ডুকে রাজা করা হয়। রাজা পান্ডুর দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী। অনেক দিন রাজা পান্ডুর কোনো সন্তান ছিল না। এই সময় রাজা পান্ডু তার দুই পত্নীকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বন-বিহারে যান। কুন্তী মহর্ষি দুর্বাসার কাছে বর হিসাবে এক মন্ত্র পেয়েছিলেন যাতে তিনি যে কোনো দেবতাকে ডেকে এনে তার প্রভাবে পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেন। রাজা পান্ডু কুন্তীকে সেই মন্ত্রের দ্বারা যেকোনো দেবতাকে দিয়ে সন্তান ধারণ করতে বলেন। স্বামীর আদেশে কুন্তী প্রথমে ধর্মরাজকে ডেকে এনে তার সহযোগে পুত্র যুধিষ্ঠিরকে লাভ করেন। এরপর এক-এক করে মরুত ও ইন্দ্রের সহযোগে ভীম ও অর্জুনকে পান। অর্জুন কুন্তীর ইন্দ্র প্রদত্ত পুত্র। এরপর পান্ডু মাদ্রীর জন্য অনুরূপভাবে সন্তান লাভের ব্যবস্থা করতে কুন্তীকে অনুরোধ করেন। সেই মন্ত্রের প্রভাবে মাদ্রী অশ্বিনী কুমার নামক দুই দেবতাকে আমন্ত্রণ করে তাদের সহযোগে নকুল ও সহদেব নামক দুই পুত্র লাভ করেন। পান্ডু আর হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন নি। এইভাবে প্রায় বছর পনের কেটে যায়। এই পাঁচ ভাই বনে ঋষিদের আশ্রমে বড় হতে থাকেন। এই সময় এক ঋষির অভিশাপে পান্ডুর মৃত্যু হয়। মাদ্রীও তাঁর শোকে মারা যান। কুন্তী এই পাঁচপুত্রকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। পান্ডুর অবর্তমানে ধৃতরাষ্ট্র কার্যনির্বাহি রাজা হিসাবে রাজ্য চালাতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র একশত পুত্র লাভ করেছেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বয়সে ছোট ।

কৌরব-পান্ডব রাজ কুমারদের শিক্ষা:

ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে আমন্ত্রণ করে হস্তিনাপুরে এনে সকল রাজকুমারদের অধ্যয়ন ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ভার দেন। দ্রোণাচার্যের শিক্ষায় রাজকুমারগণ তাদের নিজ নিজ প্রতিভা, শক্তি ও অধ্যবসায়ে শাস্ত্রজ্ঞান ও অস্ত্রবিদ্যার দক্ষতা অর্জন করেন। যুধিষ্ঠির রথচালনায় ও যুদ্ধবিদ্যায়, দুর্যোধন ও ভীম গদা যুদ্ধে, নকুল ও সহদেব অসি চালনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। দ্রোণাচার্যের শিক্ষায় এবং নিজের অস্ত্রবিদ্যার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, অসাধারণ বাহুবল, প্রতিভা, একাগ্রতা এবং অভ্যাসের ফলে অর্জুন ধনুর্বিদ্যাসহ নানা অস্ত্র চালনায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। অর্জুনের উৎসাহ ও একাগ্রতায় খুশি হয়ে দ্রোণাচার্য তাকে হস্তী, অশ্ব, রথারূঢ় ও ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধের নানা কৌশল যত্ন করে শিখিয়ে তাকে এক বীর যোদ্ধায় পরিণত করেন। অর্জুন ধনুর্বিদ্যার অনেক কৌশল যেমন শব্দভেদী বাণ চালনা ইত্যাদি নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজেই শিখেছিলেন। ধনুর্বিদ্যায় অর্জুন দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামা, কর্ণ ও অন্য রাজকুমারদের ছাপিয়ে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হয়ে ওঠেন ।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

একবার রাজকুমারদের ধনুর্বিদ্যার এক পরীক্ষায় অর্জুনের দক্ষতা ও কৃতিত্বে খুশি হয়ে দ্রোণাচার্য তার অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র অর্জুনকে দান করে তার প্রয়োগ বিধি শিখিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন "এই অস্ত্র তুমি কোনো সাধারণ মানুষের উপর প্রয়োগ কোরো না, তাতে জগৎ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো অমানুষ সহসা তোমাকে আক্রমণ করে তবে তার সংহারেই তুমি এই অস্ত্র ব্যবহার করবে, এর অন্যথা করিও না", অর্জুন "তাই হবে" বলে গুরু প্রদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করেন। অর্জুনের মধ্যে বিচক্ষণতার সঙ্গে ধৈর্য্য ও সংযমের মানসিকতা দেখেই দ্রোণাচার্য তাকে এই সাংঘাতিক অস্ত্র দিয়েছিলেন। আরও পরে অর্জুন ইন্দ্র, মহাদেবের এবং অন্যান্য দেবতাদের কাছ থেকে অনেক শক্তিশালী অস্ত্র লাভ করেন।

রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে তাদের অস্ত্রনৈপুণ্য জনসমক্ষে দেখানোর জন্য দ্রোণাচার্যের ইচ্ছায় এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে এক কৃত্রিম রঙ্গভূমি নির্মাণ করে এক শুভদিনে সেখানে রাজপরিবার, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের ও প্রজাগণের উপস্থিতিতে এক কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করা হয়। একে একে রাজকুমারগণ তাদের অস্ত্র কুশলতা দেখাতে থাকেন। দর্শকগণ রাজকুমারদের অস্ত্র কুশলতা দেখে নিজেদের নিরাপদ ভেবে খুশি হন। এই সময় দুর্যোধন গদা যুদ্ধে ভীমকে আক্রমণ করলে উভয়েই প্রবল বিক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করেন। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে দ্রোণাচার্যের আদেশে তার পুত্র অশ্বত্থামা তাদের নিবারিত করেন। অর্জুনের নানা প্রকার অস্ত্র চালনার নৈপুণ্য ও তীর নিক্ষেপের পদ্ধতি দেখে দর্শকগণ চমকিত হন। ধনুর্বিদ্যায় অর্জুন বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন এবং দ্রোণাচার্য তাকে শ্রেষ্ঠ বীর ঘোষনা করেন। সূতপুত্র কর্ণকে কিন্তু এই প্রদর্শনীতে ডাকা হয় নি। প্রদর্শনীর শেষ পর্বে যোদ্ধার বেশে সহজাত কবচ ও কুন্ডল ধারণ করে কর্ণ এসে দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে প্রণাম করে বীরদর্পে সতীর্থ অর্জুনকে বলেন, "তুমি যেসকল অস্ত্র প্রয়োগ কৌশল দেখিয়েছ অমি তার থেকেও বেশি নিপুণতা দেখাব।" তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। অর্জুনের প্রশংসায় দুর্যোধন এতক্ষণ বিমর্ষ হয়েছিলেন, এখন কর্ণকে পেয়ে তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। দুর্যোধনও অর্জুনকে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান করেন। এতে একদিকে ভীম ও অর্জুন অপরদিকে দুর্যোধন ও কর্ণের সঙ্গে প্রবল বাদ-বিতন্ডা লেগে যায়। দর্শকগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে কেউ অর্জুনের এবং কেউ কর্ণের প্রশংসা করতে থাকেন। সমূহ বিপদের আশঙ্কা অনুমান করে কৃপাচার্য্য বলেন, "রাজপুত্র ছাড়া আর কাহারো সঙ্গে রাজকুমারদের যুদ্ধের নিয়ম নেই, তাই কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হতে পারে না।" এই কথা শুনে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে দুর্যোধন কর্ণকে হস্তিনাপুর রাজ্যের অন্তর্গত অঙ্গ রাজ্যের রাজা ঘোষণা করে অর্জুনকে তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বলেন এবং পুরোহিত আনিয়ে তখনই কর্ণের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান করা হয়। এই সময় সূর্যাস্ত হয়ে যাওয়ায় দ্রোণাচার্য্য প্রদর্শনী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষার সময় থেকেই দুই ছাত্র কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে রেষারেষি ছিল। দুর্যোধন কর্ণের অস্ত্র কুশলতা দেখে অর্জুনের প্রতিপক্ষ হিসাবে নিজের স্বার্থ রক্ষায় কর্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। কর্ণের উচ্চাভিলাষ ছিল এবং সেই উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তিনি দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন আর দুর্যোধনের পান্ডবদের সঙ্গে জ্ঞাতি শত্রুতার কারণে কর্ণের মতো একজন বীরের প্রয়োজন ছিল, সেই কারণেই তিনি কর্ণের সঙ্গে নিজের প্রয়োজনে বন্ধুত্ব করেন। এই ঘটনার পর থেকে কর্ণ দুর্যোধনের বন্ধু হিসাবে পান্ডবদের বিশেষ করে অর্জুনের শত্রুতে পরিণত হন। তিনি সবসময়ই অর্জুনকে সংহার করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। এই বন্ধুত্বের ফলে কর্ণ দুর্যোধনের সকল অন্যায় কাজের সহায়তা করেছেন। ক্রমে ক্রমে কর্ণ হস্তিনাপুরের রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হয়ে পড়েন। দুর্যোধনের কারণে কর্ণের মধ্যে পান্ডবদের উপর প্রতিহিংসা পরায়ণতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। মহাভারতের বহু ঘটনার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অর্জুনের গুরুদক্ষিণা:

মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনির পুত্র দ্রোণাচার্য। তিনি ছাত্রাবস্থায় পিতার আশ্রমেই অধ্যয়ন ও তপস্যা করতেন। পাঞ্চালরাজ পৃষিতের সঙ্গে ভরদ্বাজ মুনির সখ্যতা ছিল। সেই সুবাদে পাঞ্চালরাজ পৃষিত পুত্র দ্রুপদকে ভরদ্বাজের আশ্রমে অধ্যয়ন করতে পাঠান। এই অধ্যয়নের সময়ই দ্রোণের সঙ্গে দ্রুপদের বন্ধুত্ব হয়। পরে এই দুই জনেই মহর্ষি অগ্নীবেশের আশ্রমে থেকে তার কাছে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন । শিক্ষাশেষে দু'জনেই গৃহে প্রত্যাগমনকালে দ্রুপদ দ্রোণকে বলেন, "আমি ভবিষ্যতে রাজ্যে অভিষিক্ত হলে তোমার সঙ্গে মিলিতভাবে সকল রাজ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করব।" পরে দ্রোণাচার্য পরশুরামের কাছে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন। তার পুত্র অশ্বত্থামা পিতা দ্রোণাচার্যের কাছেই অধ্যয়ন ও অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন। বেশ কিছুকাল পরে আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে দ্রোণ তার বাল্য বন্ধু রাজা দ্রুপদের সঙ্গে দেখা করে তার সঙ্গে ছাত্রাবস্থার সখ্যতার কথা তুলে তার সহযোগিতা চান। রাজা দ্রুপদ তার আগেকার প্রতিশ্রুতি ভুলে দ্রোণকে বলেন, "রাজার সঙ্গে রাজারই সখ্যতা হয়, দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজার সখ্যতা হয় না।" এই কথা বলে তিনি দ্রোণকে কোনোরকম সাহায্য না করে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। সেখান থেকে ফিরে কৃপাচার্যের সাহায্যে তিনি হস্তিনাপুরে ভীষ্মের কাছে আসেন। ভীষ্মও পরশুরামের কাছে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে চিনতেন। ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে আশ্রয় দিয়ে রাজকুমারদের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করেন।

কৌরব ও পান্ডব রাজকুমারদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে দ্রোণাচার্য তাদের সবাইকে ডেকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাস্থ করে বন্দী করে তার কাছে নিয়ে আসতে বলেন । শিষ্যগণ রাজী হয়ে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। দুর্যোধনের নেতৃত্বে কর্ণ ও কৌরব ভ্রাতাগণ আমরাই আগে যাব বলে আস্ফালন করে পাঞ্চাল রাজধানীর দিকে রওনা হন। অর্জুনের নেতৃত্বে পান্ডব ভ্রাতাগণ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ভিন্ন পথ দিয়ে পাঞ্চাল রাজধানীর বাইরে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কৌরবগণ পাঞ্চাল রাজধানী আক্রমণ করলে রাজা দ্রুপদ তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তখন কৌরবগণ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। পাঞ্চাল বাহিনী ফিরে যেতে থাকলে অর্জুনের নেতৃত্বে ভ্রাতাগণ রাজা দ্রুপদকে আক্রমণ করে, পরাস্ত করে, বন্দী করে নিয়ে গিয়ে আচার্য দ্রোণকে উপহার দেন। এই যুদ্ধে অর্জুন যথেষ্ট ধৈর্য্য, সাহসিকতা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন যার ফলে জয়লাভ করে ফিরে আসেন। দ্রোণাচার্য বন্দী, হৃত-সর্ব্বস্ব, ভগ্নদর্প দ্রুপদকে দেখে দয়াপরবশ হয়ে বলেন, "আমার আদেশেই আমার শিষ্যগণ তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করেছে। এখন তুমি সখ্যতা সহকারে আমার কাছে কি আশা কর?" দ্রুপদ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। দ্রোণাচার্য আবার বলেন, "আমি তোমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে বাসনা করি। তুমি বলেছিলে রাজা ছাড়া আর কাহারো সঙ্গে রাজার সখ্যতা হয় না, তাই আমি আজ তোমাকে এই রাজ্যের অর্ধেক অংশ ছেড়ে দিচ্ছি। এখন তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের অধিপতি হও আর আমি উত্তর অংশ শাসন করি। যদি তুমি ইহাতে রাজী থাক তবেআমার সহিত সখ্যতা কর।" দ্রুপদের তখন আর কোনো উপায় ছিল না। তখন দ্রুপদ বলেন, "আমি তোমার কথায় খুশি হলাম। তোমার সঙ্গে চিরসখ্য কামনা করি।" এইভাবে অর্জুনের বীরত্বে তাদের বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ।

অর্জুন পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদকে পরাজিত করে, বন্দী করে দ্রোণাচার্যের কাছে নিয়ে এসেছিলেন শুধুমাত্র গুরুদক্ষিণা দিতে। অর্জুন তখন নিতান্তই ছেলে মানুষ । রাজ্য জয় করা ও পাঞ্চাল সৈন্য ধ্বংস করা তার উদ্দ্যেশ্য ছিল না। তাই দ্রুপদকে বন্দী করা মাত্র তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে ভীম ও অন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ভীমকে বলেছিলেন, "শুধু শুধু দ্রুপদের সৈন্য ধ্বংস করবেন না।" এতে তার নীতি নিষ্ঠা ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা দ্রুপদ নিজেও একজন বীর যোদ্ধা। অর্জুনের বীরত্ব, যুদ্ধ কৌশল, সহৃদয় ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি অর্জুনকে তখন চিনতেন না তবু বুঝেছিলেন যে ইনি কোনো সাধারণ যোদ্ধা নন। এই ছেলেটির কথা তিনি দীর্ঘদিন মনে রেখেছিলেন।

(ক্রমশ)

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অকালবোধিনী তুমি

ইতি পাল

আশ্বিনের শারদ প্রাতে বন্দিতা অকালবোধিনী
পিতৃপক্ষের অন্তিমে যা দেবী সর্বভূতেষু বিরাজিতা
মা, দেবীপক্ষের মহালগ্ন বিসর্জিতা দর্পণে মা
সবর্মঙ্গলমঙ্গল্যে ত্রৈম্বকে গৌরীর শরণাগত মনুর
সন্তান - সন্ততি। সেই শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়পথ
প্রশস্ত করেছিলে তুমি অকালবোধিতা, লুকিয়ে নীল
পদ্ম, চেয়েছিলে রাবনে – ভক্তপ্রাণ রক্ষিতে আপনি।

হায় সময়কাল! অকালবন্দিতা, তুমি নিরবিচ্ছিন্ন
হয়ে ধরা দিলে মর্ত্যের মানবের করে, জগৎ জননী
রূপে। মিশে গেলে আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দের উৎস
হয়ে, ঢাকা পড়লে উৎসবের আতিশয্যে, আজকের
আড়ম্বরের অন্তস্হলে। রামের মত অকালবোধন ও আত্ম
নিবেদন আজ অন্তর্হিত, আজ কেবলই উৎসব – সর্বগ্রাসী
ভোগের কারবার। ঐতিহ্যের অহংকারে মত্ত, দেখনদারি
অধিকার করেছে আগাগোড়া, ভক্তি উঠেছে নিলামে ।
মহাসমারোহে চাঁদার জুলুম কায়েম, ছাড় নেই ছোট বড়
কোনো সম্প্রদায়ের, আছে শুধু শক্তি প্রদর্শন ও বাহুবল।

দুর্গারূপের সংস্হিতা মা আজ পথে ঘাটে লাঞ্ছিতা, নজর
এড়ায় মাথাদের, মুখে যত সাম্য, ভোগের ঘরে উঁকি দেওয়া
শৈশব মূক; বোবা কান্নায় ভাসে মায়ের বুক। শরতের ঐশ্বর্য
মন্দিরে স্হিত, অথচ অপেক্ষার আমিনারা শতদল ফোটা
দীঘির ধারে। দশভূজা আসে ঘরে ঘরে, দুভূজের দুর্গারা
থাকে পথে প্রান্তরে, ঝড়বৃষ্টিতে! এই আমিনারা বাঁচে বুক
জলে, ওগো অকালবোধিতা! এ কেমন বিচার মাগো বল।

আমন্ত্রণ

অরুময় চক্রবর্তী

এই মেয়ে তুই আসবি আমার সাথে?
ও হাতটা তোর রাখবি আজ এই হাতে?
চল না দু'জন দিই না পাড়ি আজ
থাক না পরে সস্তা সব ওই কাজ।
চল না আজ এই বর্ষা-ভেজা দিনে
আকাশ-মাটি-মনটাকে নিই চিনে,
বেদম ভিজে অঝোর ধারার জলে
শুনব আজ ঐ বাতাস কথা বলে।
তোর মনের ঐ গোপন কান্নাগুলো
দেখবি দূরের নিলাজ আকাশ ছুঁলো
হোক না আজ এক মন হারাবার দিন
আজ ঐ দূরের মেঘের কাছে ঋণ।
আজকে তোর ঐ ছোট্ট মুঠো-ফোন
একাই না হয় থাকুক সারাক্ষণ,
আজ ওই নীলের সন্ধানেতে আয়
লাজুক নদী মিলুক মোহনায়।
আজ চুলে তোর নিই জড়িয়ে মেঘ
থাক দূরে সব বিষণ্ণ উদ্বেগ,
তোর ঐ দুটি চোখের তারায় ভাবি
আছেই আমার সব হারাবার চাবি।
আজকে আমার কাব্যছোঁয়া সুর
পেরোয় দ্যাখ ঐ দূরের সমুদ্দুর
দিন-প্রতিদিন বেদম সং-টা সাজা
সব ভুলে আজ হই না আমি রাজা।
যাক ভেসে যাক সমাজ-বাঁধন সব
থাক না বেঁচেই তোর এই অনুভব।
আজ এই লাজুক মিষ্টি হাওয়ার বোল
ওই শরীরে তুলুক না হিল্লোল
চল না কুড়োই কয়েক কুচি গান
দু'চারখানা কান্নাভেজা তান।
এই মেয়ে তুই আসবি আমার সাথে?
বল না রে তুই আসবি আমার সাথে?

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

নির্জন পথে প্রান্তরে

সোমনাথ চ্যাটার্জ্জী

ভ্রমণ কাহিনী

কিশোর বয়সে বিশ্ববিখ্যাত শিকারি ও পরিবেশবিদ জিম করবেটের রচনা সমগ্র এবং প্রাক যৌবনে বুদ্ধদেব গুহর লেখা "কোয়েলের কাছে" পড়ে জঙ্গলের সঙ্গে পরিচয় ও পরবর্তীতে জঙ্গলের প্রেমে বিভোর হয়েছিলাম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ছোট বড় নানা জঙ্গল আমায় টেনেছে তাদের কাছে। জঙ্গলের নিস্তব্ধতা, শুকনো পাতার মড়মড়ে শব্দ, অজানা পাখির ডাক, সবুজের সমারোহ এবং জঙ্গলের এক অদ্ভুত গন্ধে ঘুরে বেড়াতে আজও ভীষন ভাল লাগে। প্রকৃতির খুব কাছে যাওয়া যায়। বার কয়েক ছুটে যাওয়া ডুয়ার্সের জঙ্গলে, করবেট ন্যাশানাল পার্ক, গির অরন্য, পেরিয়ারের জঙ্গল, কাজিরাঙ্গা, পালামৌ, সুন্দরবন ও আরও কয়েকটি ছোটখাটো যেমন বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গল, মেদিনীপুরের গড়বেতার জঙ্গল ইত্যাদি। কত রকমের চেনা অচেনা গাছ, ফুল, পাখি, নানান জন্তুর পায়ের ছাপ আর ওই এক বিশেষ গন্ধ যা শুধুমাত্র জঙ্গলেই পাওয়া যায়।

স্কুলের গন্ডি পেরিয়েই চার বন্ধু মিলে ঠিক করলাম বেড়াতে যাব। আমার এক বন্ধুর আত্মীয় থাকতো রাঁচিতে। কলকাতা থেকে রাঁচি সেখান থেকে নেতারহাট তারপর বেতলার (পালামৌ) জঙ্গলে এবং শেষে রাঁচি থেকে ট্রেনে আবার কলকাতা ফেরা। "রাঁচি- হাতিয়া" এক্সপ্রেসে পৌঁছে গেলাম রাঁচি। সালটা তখন ১৯৮০। তখনও ঝাড়খণ্ডের জন্ম হয়নি। রাঁচি তখন বিহারের অংশ। বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড হয় ১৫ই নভেম্বর ২০০০ সালে। রাঁচিতে এক বন্ধুর মামা থাকতো। দু'দিন ওখানে কাটিয়ে হুড্রু ফলস, জোনা ফলস দেখে সেই বন্ধুর মামার থেকে বেড়ানোর ট্যুর প্ল্যান নিয়ে বাসে করে পৌঁছলাম নেতারহাট। প্রায় ১৫৪ কিমি রাস্তা। পাহাড়ের পাকদন্ডি ঘুরে ঘুরে বাস উঠতে লাগলো। চারদিকে শাল, মহুয়া, ঝাউ আর পাইনের ঘন বন। অপূর্ব দৃশ্য। বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে সরকারি লজে একটা ঘর পাওয়া গেল। হাল্কা ঠান্ডার প্রলেপ। ভিউ পয়েন্টে গিয়ে চারদিক দেখতে লাগলাম। নেতারহাটের উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ ফিটের একটু বেশি। যতদূর চোখ যায় ঘন জঙ্গলে ঢাকা। প্রকৃতির এমন রূপ মন ভরিয়ে দিল। তাই নেতারহাট ছোটনাগপুরের রানি নামে পরিচিত। এমন সময় চোখে পড়লো অনেক দুরে রূপোর পাতের মত চকচক করে বয়ে চলেছে কোয়েল নদী। ঠিক যেমন বর্ণনা পড়েছিলাম "কোয়েলের কাছে" বইতে। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি হল। এই সেই কোয়েল নদী। ছুঁয়ে দেখার অদম্য ইচ্ছে হল। ঠিক হলো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে নদীর ধারে যাব। ওখানে স্নান করে ফিরে আসবো। লজের লোক শুনেই বলল, খবরদার যেও না তোমরা। পাহাড়ের উপর থেকে ওমন মনে হচ্ছে, ভাবছ, এই তো সামনে। কোয়েল নদী এখান থেকে ১০ কিলোমিটার। এখন হাঁটা শুরু করলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে নদীর ধারে পৌঁছতে। তাছাড়া জঙ্গলের পথ তোমরা চেনো না। অনেক ভাল্লুক আছে। যে কোনো মুহূর্তে তাদের আক্রমণ হতে পারে। বেড়াতে এসেছো বেড়িয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে যাও। যাব্বাবা, সব আশায় তো জল ঢেলে দিল লজের সেই ভদ্রলোক। ভাল্লুক বলতে সেই ঈশপের গল্পের কথা মনে পড়লো। তিন বন্ধু ও ভাল্লুকের গল্প। আর একবার পাড়ায় ভাল্লুকের খেলা দেখাতে নিয়ে এসেছিল। নানা খেলা দেখানোর ফাঁকে সারাক্ষণ সে ঢুলছিল। তারা যে হিংস্র আক্রমণাত্মক হয় জানা ছিল না। ওরা এখন বনের মধ্যে মহুয়া খেতে আসে। সামনে কেউ পড়লে নিস্তার নেই। চার বন্ধু নেমে এলাম এবং লজের পিছন দিক দিয়ে হেঁটে এলাকা ঘুরতে বের হলাম। লাল মাটির রাস্তা। শাল মহুয়ার ঘন জঙ্গল। নিস্তব্ধ। আমরা হাঁটছি। একটু পরে পাথুরে এবড়ো খেবড়ো পথ। একটি স্থানীয় আদিবাসী আমাদের দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। নদীতে যাবার রাস্তা জিজ্ঞেস করাতে হাত তুলে দূরে দেখিয়ে সে চলে গেল। সেই দিশায় এগোতেই দেখলাম পাহাড়ি ঝরনা। এমন সুযোগ ছাড়া গেল না। সঙ্গে ব্যাগে গামছা ছিল। প্রকৃতির কোলে অচেনা ঝরনার জলে গা ভিজিয়ে নিলাম। কিন্তু আর না এগিয়ে লজে ফিরে এলাম প্রবল ক্ষিদের তাড়নায়। বিকেলে সুর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করলাম ভিউ পয়েন্ট থেকে।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

পরের দিন নেতারহাটকে বিদায় জানিয়ে বাসে করে ডালটনগঞ্জ। ওখান থেকে বেতলার দুরত্ব মাত্র ২৫ কিলোমিটার। ডালটনগঞ্জে লাঞ্চ সেরে বেতলা যাবার বাসে উঠলাম। বাসটি মহুয়াটাঁড় হয়ে যাবে। কন্ডাক্টার বলল সে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবে। ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকজন বসে। দেখলাম এক প্যাসেঞ্জারের দুটো ছাগল বাঁধা বাসের সিটের সঙ্গে। মানুষ ছাগল সব একসঙ্গে চলেছে। দুর্গন্ধে ভিতর থেকে বেরিয়ে সোজা বাসের মাথায় চড়ে বসলাম। কন্ডাক্টার বলে দিল সাবধানে ধরে বসতে কারণ অনেক সময় বড় বড় গাছের ডালপালায় ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকে। কিছুটা পাহাড়ি রাস্তা ও পরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবে। বাস ছুটে চলেছে আর আমরা মুক্ত বিহঙ্গের মতো বাসের ছাদে। মাঝে মাঝে বড় ডালপালা এল বটে, তবে তৈরি ছিলাম। শুয়ে পড়ে তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম। ঘন্টাদুয়েক পর বাস দাঁড়ালো। কন্ডাক্টার বলল এখানে নেমে যাও ভাই তোমরা। একটু বাঁদিকে এগিয়ে গেলেই বেতলা ফরেস্টের অফিস। সেই সময় প্রাইভেট হোটেল ছিল না বললেই হয়। বনবিভাগের থাকার ব্যবস্থা ছিল, খাবার ক্যান্টিনে ছিল। মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। প্রসঙ্গত আমাদের কোনো বুকিং নেই। আরও কয়েকটি গ্রুপ দেখলাম যাচ্ছে। চারিদিক ভেজা ভেজা। বৃষ্টি হয়ে গেছে। অফিসে গিয়ে শুনলাম কোনো ঘর খালি নেই। তবে বাইরে টেন্টে থাকতে চাইলে ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু টেন্টের ভিতর সেরকম কিছু ব্যবস্থা নেই। অগত্যা রাজি হলাম। একটা মোটা শতরঞ্চি পাতা। ঠিক করলাম চারজন তাস খেলেই রাত কাটিয়ে দেব। জঙ্গল সাফারির বুকিং হলো পরের দিন রাত এগারোটায়। মাঝরাতে হঠাৎ বাজি ফাটানোর শব্দে টেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। কাঁটাতারের বেড়া। দূরে লোকজনের আওয়াজ। কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম পাশের গ্রামে হাতির পাল ঢুকছে। ওরাই বাজি ফাটিয়ে হাতি তাড়াচ্ছে। এদিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সামান্য ভোর হতেই সবার অলক্ষ্যে চারজন বেরিয়ে পড়লাম হাতির খোঁজে। জঙ্গলের গেটের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে পিচের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। তখন ভোর পাঁচটা হবে। অনেকটা এগিয়ে গেছি। দেখলাম জঙ্গলের কাঁটাতারের ফেন্সিং ছেঁড়া। মানে হাতির পাল ঢুকেছে তার চিহ্ন। হাতির দেখা পাচ্ছি না। চারদিকে কোনো শব্দ নেই। হঠাৎই এক অচেনা জন্তুর ডাকে চমকে উঠলাম। এক বন্ধু বলল বাঘের ডাক হতে পারে। ব্যস! হয়ে গেল। দৌড় আর দৌড়। প্রাণভয়ে চারজন দৌড়চ্ছি গেটের দিকে। গেট পেরিয়ে সামনের এক চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। সে সবে উনুনে চা বসিয়েছে। আমরা হাঁপাচ্ছি আর ঘামছি দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলো। আমাদের কথা শুনে তার চোখ ছানাবড়া! বলল, তোমরা হাতি খুঁজতে গেছিলে? কি ভাবছো হাতি এত বড় যে দুর থেকে দেখা করে আসবে? ওরা কত চালাক জানো? হাতি যদি তোমায় দেখতে পায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। অপেক্ষা করবে যতক্ষণ তোমাকে নাগালের মধ্যে পায়। তোমরা বুঝতেই পারবে না কাছেই হাতি আছে। আর ওদের সঙ্গে দৌড়ে পারবে না। ওরা চিড়িয়াখানার হাতি নয়। ভীষণ ভয়ংকর। আর তোমরা যে দিকটা গিয়েছিলে যদি রেঞ্জার জানতে পারে এক্ষুনি বেতলা থেকে বের করে দেবে কারণ ওই দিকটাই টাইগার রিজার্ভ কোর এরিয়া। বিনা পারমিশনে গেটের তলা দিয়ে গিয়ে তোমরা হাতি দেখতে গিয়ে খুব ভুল ও বিপজ্জনক কাজ করেছ। কোনো ঘটনা হলে রেঞ্জারের উপর দায় আসতো। সুতরাং একদম চুপচাপ থেকো। কাউকে কিছু বল না। আমরা প্রাতরাশ করার জন্য সরকারি ট্যুরিস্ট ক্যান্টিনের দিকে এগিয়ে চললাম। রাত এগারোটার সময় জীপ সাফারি। উত্তেজনায় সময় কাটাতে চাইছিলনা। এখন অবশ্য রাতে আর কোনো সাফারি হয় না। ভোর ও বিকেলে দু'টি ট্রিপ।

সরকারি ক্যান্টিনে মুরগির ঝোল ও রুটি খেয়ে আমরা চার বন্ধু ও এক দম্পতি, দুই সশস্ত্র গার্ড নিয়ে হুডখোলা জীপে রাত এগারোটায় রওনা দিলাম। জঙ্গলে ঘোরবার কিছু অলিখিত নিয়ম থাকে। যেমন অত্যন্ত উজ্জ্বল রঙের পোষাক না পরা, পারফিউম ব্যবহার না করা। নিস্তব্ধতা বজায় রাখা। কেউ কোনো জন্তু জানোয়ার দেখলে উত্তেজনায় আরেক জনকে ডেকে দেখানোর চেষ্টা না করা। আমাদের থেকে ওদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রানশক্তি অনেক অনেক গুন বেশি। তাদের রাজত্বে আমরা প্রবেশ করছি একবার প্রকৃতির মধ্যে তাদের দেখবো বলে সুতরাং অলিখিত নিয়ম না মানলে বিপদের আশঙ্কা থাকে। দু'জন গার্ড তীব্র সার্চলাইট এদিক ওদিক করে দেখাচ্ছে। ধীরগতিতে জীপ এগিয়ে চলছে গভীর জঙ্গলের

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

মধ্যে দিয়ে। শুনেছি এখানে হাতি, হরিণ, বাইসন, বুনো শুয়োর, ভাল্লুক, শম্বর এবং বাঘ রয়েছে। রয়েছে হয়তো আরও কিছু ছোটখাটো যেমন, শিয়াল ,হায়না ইত্যাদি। কেউ বলেছিল কোনো জঙ্গলকে বিশ্বাস করা যায় না, যে কোনো হিংস্র জানোয়ার থাকতে পারে। অতএব সর্বদা সাবধান। তবে তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। পেলেও এক সেকেন্ডের কম সময়ে বিদ্যুতের ঝলকের মতো ক্ষিপ্র গতিতে তারা মিলিয়ে যায় গভীর থেকে গভীরে। দেখা পেলাম পাঁচ ছ'জনের এক বাইসন ফ্যামিলির, খেঁকশিয়াল, হরিণের দলের। হাতি যাবার টাটকা নিশান দেখলাম। গাছপালা ভাঙ্গা দোমড়ানো মোচড়ানো। গার্ড বললো কিছুক্ষণ আগেই একটা দল গেছে। না, আর বিশেষ কিছু চোখে পড়েনি। তবে অত রাতে জঙ্গলে ঘোরার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এখনো ভুলতে পারিনি।

শীত ও পশমের দিন আজ

সুভান

সাঁঝবাতির নীচে জেগে বসে থাকা জোনাকিরা
কেমন পালক-পালক আদর জড়িয়ে থাকে।

শীত ও পশমের দিন আজ...
উলের ভেতর ঘুমিয়ে থাকার দিন।

হলুদ আলো; নীল সোহাগ
কুয়াশার সহবত...

এসব লিখে রাখার মতো ছোট গল্পের আতর
গায়ে গায়ে লেগে থাকে; আঙুলের ইশারায়
চোখের চুপ-কথায়, হুডির ভেতর
সাজিয়ে রাখা শীতের পনিটেল...

এসব লিখে রাখবো বলে জোনাকি খুঁজে বেড়াই আমি
জোনাকির কাছে বুকের দেওয়াল রেখে বলি
আমার আঁধার জুড়ে আলোক পঙক্তি লেখো...

বিকেল সন্ধ্যে রাত
রাস্তা টেবিল হাত
কফি সিগারেট ঠোঁট

সহবত লিখে রাখবো বলেই এসব খেলা
তোমার কাছে গেলেই জীবন নিমেষে চড়াই পাখির মতো
ঘরের ভেতর বাসা করে। ঘুলঘুলির ভেতর পালক রাখে।

আজ শীত ও পশমের দিন
আজ অন্তত কিছু লিখে রাখতে হয়...

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অবচেতন

দেবাঙ্গনা বিশ্বাস

চোখ খুলতেই কেমন যেন একটা সন্দেহ হল। এটা কোন বাড়ি? মাথার ওপর বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকা পাখাটা অপরিচিত। খাটের বাঁ পাশে একটা ছোট্ট টেবিল, তার ওপাশে একটা জানালা। তাতে লম্বা লম্বা লোহার শিক বসানো। তার পেছনে বোধহয় একটা বারান্দা আছে। কিন্তু বারান্দায় যাওয়ার দরজাটা কোন দিকে? দরজাটা খুঁজতেই যেন উঠে বসল ও। কিন্তু কোথায়? এই ঘর থেকে তো বারান্দায় যাওয়ার কোনো দরজা নেই! তাহলে? তাহলে কি পাশের ঘরে? খাট থেকে নেমে স্লিপারে পা গলাতে গিয়ে দেখল সেটাও নিখোঁজ। এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল ঘরটা। প্রায় বর্গাকার একটি ঘর। বেশ পুরোনো বলেই বোধ হয়। মুখোমুখি দু'টি দেওয়ালে দু'টি দরজা, মাথার ওপর কড়িবর্গার ছাদ থেকে লম্বা লোহার রড দিয়ে ঝুলন্ত একটি পাখা। কোন দরজা দিয়ে গেলে বারান্দায় যাওয়া যাবে কিছুতেই সেটা ঠিক করে উঠতে পারল না ও। অগত্যা খালি পায়েই উল্টোদিকের দরজাটার দিকে পা বাড়ালো।

পাশের ঘরটা নেহাতই ছোট। মনেহয় রান্নাঘর জাতীয় কিছু হবে। একটা পুরোনো ঝুল পড়া স্টোভ রাখা এককোণে। ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের কিছু বাসনপত্র একধারে জমা হয়ে আছে। তার উপর একটা আধভাঙা প্লাস্টিকের কল থেকে টপ্ টপ্ করে অনবরত জল পড়ে চলেছে। শুয়ে শুয়ে বুঝি এই আওয়াজটাই শুনতে পাচ্ছিল ও। একটা নির্দিষ্ট তালে অনবরত টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ টপ্। যেন এক অদৃশ্য উপস্থিতি। কিন্তু সেই দরজাটা! বারান্দায় যাওয়ার যে দরজাটা খুঁজতে এ ঘরে এসেছিল ও, সেটা কোথায়? ফিরে এল আগের ঘরটায়। হঠাৎ মুষড়ে উঠল মনটা। সত্যিই তো, এটা কোন বাড়ি? কোন শহরই-বা? ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসা স্মৃতির অতলে এরকম একটা বাড়ির খোঁজ হয়ত মিলল। কিন্তু তবুও হতভম্বের মতো ঘরের মাঝখানে বসে থাকল কিছুক্ষণ। মাথার উপরে একনাগাড়ে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘুরতে থাকা পাখা, রান্নাঘরের কল থেকে অনবরত পড়তে থাকা জল আর উই পোকার কাঠ কেটে ফোঁপড়া করে দেওয়ার আওয়াজ – সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে ও। হঠাৎ চমক ভাঙল একটা শব্দে। এটা কিসের শব্দ? একটা পুরোনো আওয়াজ। খুব পরিচিত, অথচ হারিয়ে যাওয়া। ঠিক হারিয়ে যাওয়া নয়, হারিয়ে ফেলা শব্দ। কিন্তু কীসের? বহুদিন এই আওয়াজ পায় নি ও। তাহলে? মাথার ভেতর পাক খেতে থাকল আওয়াজটা। কিন্তু কিছুতেই, কিছুতেই নাগাল পেয়ে উঠল না। চেনা, চেনা, ভীষণ চেনা - কিন্তু তবুও অস্থির লাগতে থাকল মাথার ভিতর। কানের পাশ দিয়ে নেমে আসা ঘাম, ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসা দৃষ্টি জানান দিল, মুক্তি নেই। স্মৃতিদের মুক্তি নেই। মাথার চুলগুলোকে আঁকড়ে ধরে মেঝেতে বসে পড়ল ও। পরক্ষণেই রান্নাঘরে চলতে থাকা আওয়াজটাকে অসহ্যকর মনে হল। একছুটে রান্না ঘরে গিয়ে স্টোভটাকে তুলে ছুঁড়ে মারল কলটাকে লক্ষ্য করে। স্টোভটা কলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে একটা বীভৎস আওয়াজ করে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু কলটা তখনও একইভাবে আওয়াজ করে চলেছে - টপ্ টপ্ টপ্ টপ্। কেমন যেন অসহায় মনে হল নিজেকে। প্রচন্ড পরিশ্রান্ত যেন ও।

ধীর পায়ে আবার ফিরে এল পাশের ঘরে। আর ঘরে ঢুকতেই আচমকা একটা কথা মাথায় এল। আচ্ছা এই ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা শেলফ ছিল না? বই ভর্তি শেলফ। পরপর রাখা থাকত রবীন্দ্র রচনাবলীর সবক'টা খন্ড। সেটা কোথায়! আর ওই, ওইদিকে ক্যারামবোর্ডটা রাখা থাকত। গুটিগুলো থাকত খাটের পাশের টেবিলের ড্রয়ারে। সেসব? সেসব কোথায় গেল! "মা! মা!" বলে প্রবল চিৎকার করতে করতে ঘরের অন্যপাশের

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে মা-কে খুঁজে না পেয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েই একটা আওয়াজে থমকে দাঁড়াল। বাঁ দিকের দেওয়ালে দরজা, তার ওপারে বারান্দা। ওটা খবরের কাগজের পাতা ওল্টানোর শব্দ। দরজা ভেদ করে বারান্দায় উপস্থিত হয়েই প্রথম প্রশ্ন – "মা কোথায় গো?" বাবা চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন রান্নাঘরে। বারান্দা থেকে বেরিয়ে মা-বাবার ঘর হয়ে, নিজের ঘর টপকে রান্নাঘরে এসে দেখল মা স্টোভ, কড়াই আর নিজের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে একে একে মাছ তেলে ছেড়ে চলেছে। বাড়িতে চোর ঢুকলে ডান্ডা নিয়ে তেড়ে যাওয়া নির্ভীক মহিলাটিকে সামান্য একটুকরো মৃত প্রাণী কী পরিমান নাজেহাল করে তুলেছে দেখে খানিক হাসি পেল। তারপরেই আসল কথাটা মনে পড়ে গেল। চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে এবার শুরু করল – "ওমা আমার পাঞ্জাবিটা কোথায়? স্নান করে কখন থেকে খুঁজছি। জলদি দাও। আর যা খেতে দেবে দিয়ে দাও। আমি দশ মিনিটে বেরোবো।" বলেই নিজের ঘরে এসে বইয়ের শেলফটা থেকে পটাপট দুটো বই ব্যাগে ঢুকিয়ে ব্যাগটাকে খাটের ওপর ফেলে খাটের পাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা পেন আর মানিব্যাগটা নিয়ে ব্যাগের সামনের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল খাওয়ার রেডি। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে এক নিঃশ্বাসে সবটা নিঃশেষ করে পাশের ঘরে এসে ব্যাগটা নিতে গিয়েই খটকা লাগল। কোথায় গেল? কী আবার! আরে ব্যাগটা! এই মাত্র যেটা গুছিয়ে রেখে গেলাম খাটের উপর! ভারী মুশকিল দেখি! "মা! ও-মা! ব্যাগটা কোথায় সরালে? আরে আমি বেরোবো না নাকি? অদ্ভুত সব!" বলতে বলতে রান্নাঘরে গিয়ে তো অবাক। কোথায় মা! কড়াই, মাছ, মা কোনোকিছুই নেই। স্টোভটা ভাঙা অবস্থায় কলের কাছে গড়াগড়ি খেয়ে চলেছে। আধভাঙা কল থেকে অনবরত জল পড়ে চলেছে টপ্ টপ্ টপ্ টপ্। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাবা-মায়ের ঘরের দিকে ছুটল ও। কিন্তু কোথায় কী! ঘর খালি। খাটটা পর্যন্ত নেই ঘরে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মনে পড়ল দরজাটার কথা।

বন্ধ দরজা। দীর্ঘদিন ধরে অযত্নে অব্যবহারে, উঁইয়ের কারুকর্মে ফোঁপরা কাঠদুটো একটু জোরে টানতেই খুলে গেল। একটা পাল্লা প্রায় আধভাঙা অবস্থায় একপাশে হেলে রইল। বারান্দার জং ধরে যাওয়া লোহার রেলিঙের ওপরের কাঠের হাতলটা প্রায় নেই বললেই চলে। হঠাৎ মনে পড়ল বাবার কথা। বাবা। হ্যাঁ, বাবা কাগজ পড়ছিল বারান্দায় বসে। কিন্তু কই? চেয়ারটাই-বা কোথায়? মাথার ভিতর আবার কেমন যেন পাক খেয়ে উঠল একটা ঝড়। শুধু নেই নেই আর নেই। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল "ফিরিয়ে দাও। সেই সব কিছু, যা ছিল। যা নেই। সব সব।" কিন্তু, ভাবতে ভাবতেই আবার একটা শব্দে চমক ভাঙল। আবার সেই শব্দটা। রেলিং ধরে উঁকি দিতেই উৎস ধরা দিল চোখের সামনে - রিকশার হর্ণ। হ্যাঁ। তবে এতক্ষণ মনে পড়ছিল না কেন! সেই রাবারের তৈরি গোল মতো কালো রঙের হর্ণ। এতক্ষণ সেটা মাথায় আসছিলই না। ঠোঁটের কোণে আলতো হাসি নিয়ে পেছন ঘুরতে গিয়ে আচমকাই থমকে দাঁড়াল। পাশে বাবা দাঁড়িয়ে। একটা সাদা রঙের ফতুয়া আর নীল-সাদা খোপ কাটা লুঙ্গি পড়ে রেলিঙে ভর দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে বাবা। ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে আটকে আছে চশমাটা। চোখ দুটো করুণ এক আকুতি নিয়ে চেয়ে আছে নিচের দিকে। কী যেন দেখছে! আরেকটু পেছন ফিরতেই দেখতে পেল মা-কে। খাটে বসে আছে মা। একটা পা ঝুলিয়ে, অন্য দিকে মুখ করে। একহাত দিয়ে অনবরত মুছে চলেছে চোখ। কিন্তু কেন? এবার পেছন ফিরে রেলিং দিয়ে নিচে তাকাতেই কারণটা খুঁজে পাওয়া গেল। বাড়ির নিচে নীল-হলুদ ট্যাক্সিটায় বোঝাই হচ্ছে মালপত্র। একটা কালো ট্রলি হাতে করে নিচের তলার দরজা দিয়ে একজন বেরিয়ে এসে সেটা ড্রাইভারকে দিয়ে দরজা খুলে ট্যাক্সির ভেতরে গিয়ে বসল। জানলা দিয়ে মুখ বের করে একবার উপরের দিকে চেয়ে হাত নাড়তেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। বাবা তখনও তাকিয়ে অপলক দৃষ্টিতে। বাঁ হাতটা বুকের বাঁদিকে চাপা দেওয়া। চশমা সমেত ডান হাতটা কাঁপতে কাঁপতে একবার উপরে উঠল

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

যাত্রীর উদ্দেশ্যে। তারপর এক পা, দু'পা করে পিছন ফিরে ওর পাশ দিয়ে ঘরের দিকে চলে গেল। আবার একটা শব্দ। কেঁপে উঠল যেন ভেতরটা। যেতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে সামনের দিকে পড়ল বাবা। মনে হয় দরজাটা ধরার চেষ্টা করেছিল। একটা জোরে শব্দ করে বাবাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দরজাটা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। বাবার মুখটা নিচের দিকে। মাথার ভেতরটা কেমন হালকা মনে হল। ও এখন বাবার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে বাবার শরীরটা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। মাথাটা খাটের কোণায় ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়েছে। ধীরে ধীরে একটু একটু করে লাল হয়ে গেল মাথার চারপাশ। লাল। গাঢ় লাল। মা কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে বসেছিল এতক্ষণ। কেমন যেন চোখ দুটো মা-র। ভয় করল ভীষণ। একটা চাপা কষ্ট - যেন শ্বাস নিতে পারছে না ঠিক করে। "এখন! এখন কী হবে? কী করবে?" - ভাবতে ভাবতে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল মা ---

চোখ মেলল আয়ুধ। কানের পাশ দিয়ে হঠাৎ শিরিশিরিয়ে কী যেন গড়িয়ে পড়ল। লাফ দিয়ে উঠে বসেই বুঝতে পারল ঘামছে। গায়ের টি-শার্টটা জবজব করছে ঘামে। একটু ওপরে তাকাতেই চোখ পড়ল এ.সি-তে। ১৬-তে চলছে এ.সি। তাতেও এইভাবে ঘেমে উঠেছে ও। এঘরে কোনো পাখা নেই। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। দরজাটা কোথায়? খাট থেকে নামতেই জুতোটা পায়ে ঠেকল। জুতোয় পা গলিয়ে এগিয়ে যেতেই বুঝল এদিকে আর ঘর নেই। তাহলে রান্নাঘরটা? আর দরজাটা? সেই দরজাটা কোনদিকে? যে দরজাটার কাছে বাবা পড়ে গেছে। মা একা। ডাক্তার চাই। কিন্তু দরজাটা কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারল না আয়ুধ। ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে করতে হঠাৎ তীব্র শব্দ করে এলার্ম-ঘড়িটা বেজে উঠল।

এটা বম্বে। এঘরে কোনো খোলা জানলা নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াল আয়ুধ। তখনও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি ঘটনাগুলো থেকে। এক অদ্ভুত শূন্যতা কাজ করে চলেছে মাথার ভেতর। ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছিল স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়, কিন্তু আজ বুঝল কিছু কিছু সত্যি স্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে বাইশ বছর পর।

স্মৃতি

ইন্দ্রনীল রায়

নির্জন নিস্তব্ধ দ্বীপে
দাঁড়িয়ে আছি
আমি একা-
উচ্ছ্বসিত জলরাশিতে
যৌবনের ভৈরবী নাচ।
একদিন এ পথে
কলম্বাস এসেছিল
নতুনের সন্ধানে।
সৃষ্টি হয়েছিল
নতুন দিগন্ত
সেজেছিল ঔপনিবেশিকের
বানিজ্য তরী স্বর্ণ অলংকারে।
ইতিহাসে আজ শুধু স্মৃতি কথা;
দ্বন্দ্ব আর দাঙ্গার
বিষাক্ত স্মৃতি
ভরে তুলবে আগামীর ইতিহাস।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ফেলে আসা দিনগুলি

শর্মিলা সেনগুপ্ত

ষাটের দশকের জলপাইগুড়ি শহর। করলা নদীর ধারে হাকিমপাড়ায় আমাদের বাড়ি ছিল। সে কতকাল আগের কথা। জীবনের শেষবেলায় এসে সেই বহু আগের ছেড়ে আসা শহরের, ফেলে আসা দিনগুলির কথা খুব মনে পড়ে।

সেই লাল টিনের চালওয়ালা বাড়ি - লম্বা উঠানের পাশ দিয়ে তারের জালি দেওয়া বাগান - তাতে গন্ধরাজ, দোলনচাঁপা, মেরুন রঙের আভাস-ছোঁয়া সাদা কুন্দফুল, পঞ্চমুখী গোলাপি জবা আরও কত গাছ। পেয়ারা গাছটা টিনের চাল ছাড়িয়ে সোজা উঠে গিয়েছে, তাতে গাছভর্ত্তি পেয়ারা হতো। মই দিয়ে চালে উঠে ঝুড়িভর্ত্তি পেয়ারা পাড়া হতো।
বৃষ্টির রাতে টিনের চালে বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। ভোররাতে সিলিঙের ধুপধাপ আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেত। ঘরময় আতপচালের গন্ধ - মা বলতেন ভাম এসেছে।
উঠোনটা ছিল আমাদের খেলাধূলা ও নানা কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। এক্কাদোক্কা, কুমীরডাঙা, বেড়ার দু'দিকের খুঁটিতে পুরানো উল টাঙিয়ে হাইজাম্প দেওয়া, সেটাকেই কখনও উঁচু করে বেঁধে ব্যাডমিন্টন খেলার নেট তৈরী করে খেলা, সবই চলত। উঠানের এককোণে ছায়ায় বসে শিল কাটাতে আসত একজন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শিলের ওপরে তার নিপুণ হাতের মাছ, ফুল ইত্যাদি নক্সা করা দেখতাম। কাপড়ের গাঁঠরী নিয়ে ফেরিওয়ালা আসত, গাঁঠরী খুলে শাড়ীর সম্ভার নিয়ে বসত, মা-দিদিরা, পাড়ার মহিলারা ভীড় জমাতেন। আর একজন আসত কয়লাওয়ালা - মুখলাল কয়লার বস্তা নিয়ে। কয়লার গুঁড়োয় কালো হয়ে যাওয়া ফতুয়া গায়ে, পায়ে টায়ারের কালো চটি। কয়লার বস্তা ঢেলে দিয়ে, হাত পা ধুয়ে মেঝেতে বসে বড় এক গেলাস চা আর মুড়ি খেতে খেতে নানারকম গল্প করত বাংলা-হিন্দী মিশিয়ে। আরেকজন বোষ্টম-বাবাজি এসে একতারা বাজিয়ে গান করতেন, আমরা মুগ্ধনয়নে সেই লাউয়ের খোলের বাদ্যযন্ত্রটি পর্যবেক্ষণ করতাম।
উঠানে খাটিয়া পেতে লেপ-কম্বল গরমজামা রোদে দেওয়া হতো। আচার-আমসত্ত্বও দেয়া হতো তবে বেশিরভাগ সময়ে মা মইয়ে উঠে চালে আচারের পাত্র রাখা পছন্দ করতেন যাতে রোদও বেশি পায় আবার আমরা সহজে নাগালও না পাই।
শিশুমহল স্কুলপর্ব শেষ করে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে ভর্ত্তি হলাম। খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো স্কুল। অনেক ফুল ও ফলের গাছ ছিল। আমাদের ক্লাসে আমার নামেরই একজনের সাথে খুব বন্ধুত্ব হল। আমাদের দু'জনেরই পোষ্য ছিল বেড়ালছানা, দু'জনেরই গল্পের বইয়ের নেশা ছিল।
বাড়ির কাছে করলা নদীতে একটা কাঠের পুল ছিল, হাঁটার সময় দুলত তাই বোধহয় দোলনাপুল বলা হতো। একবার ছট্ পুজোর সময় অত্যধিক ভীড়ের চাপে পুল ভেঙে নদীতে পড়ে বহুলোক হতাহত হয়। পরে ওখানে পাকাব্রীজ তৈরি করা হয়।
বাড়ীর পাশে করলা নদীর ওপারে বড় মাঠে ১৯৬৫তে যুদ্ধের সময় মিলিটারি ক্যাম্প করা হয়েছিল। বড়রাস্তা দিয়ে অনবরতঃ বড় বড় মিলিটারি ট্রাক যেত, মাঝেমাঝে ভারী চেনওয়ালা ট্যাঙ্ক যেত, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি সব থরথর করে কাঁপত। স্কুলে ওইসময় আমাদের মহড়া দেওয়ানো হতো -সাইরেন বাজলে কী করণীয়, কাঁচের পাল্লায় ফালি করে কাটা খবরের কাগজ লাগানো ইত্যাদি।
একবার স্টেডিয়ামের মাঠে কোনো কারণে হেলিকপ্টার নামবে শোনা গেল - ছেলেবুড়ো সব পিলপিল করে ছুটল স্বচক্ষে দেখতে বলাবাহুল্য আমরা ছোটরাও ছুটেছিলাম।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

আমাদের ছোটবেলায় নতুন সিনেমার প্রচার হতো রিক্সা করে মাইকে আর সেইসঙ্গে লাল নীল হলুদ নানারঙের পাতলা ফিনফিনে সিনেমার ছবিওয়ালা কাগজ বিলি করা হতো। বন্ধুরা কেউ কেউ সেগুলো নিতে ছুটত। আমার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও বাড়ির শাসনে তা সম্ভব হতো না।

বাবা চা-বাগানের ডাক্তার ছিলেন। ছুটিছাটায় আসতেন বাড়িতে। আমরা গরমের আর পুজোর ছুটিতে (তখন দুটোই বেশ দীর্ঘ থাকত) চা-বাগানে যেতাম, স্কুল খোলার আগে ফিরে আসতাম। যাওয়ার আগেরদিন আনন্দটা একটু বেশিই হতো কারণ বিশাল হোল্ডোল, ট্রাঙ্কে অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে বইখাতাও ঢুকে যেত, পড়তে হতো না সেদিন ।

চা-বাগানের শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনে অন্য রকম আনন্দ ছিল। সকালে পড়তে বসে চোখ চলে যেত কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে চা-পাতা তোলার দৃশ্যে - দুধের শিশুকে সামনে বেঁধে নিয়ে মা-শ্রমিকেরা পিঠের টুকরিতে নিপুণহাতে ত্বরিতগতিতে কচি চা-পাতা তুলছে। সন্ধ্যাবেলায় লণ্ঠনের আলোয় পড়তে বসতাম। হাসপাতালের সামনের মাঠে খেলতাম। মাঠে চোরকাঁটা ছিল, দিদিদের শাড়িতে নীচের দিকে কাঁটা লেগে যেত। ছোট হওয়ার সুবাদে আমাদের ছোট দুইবোনের বিরক্তিকর কাজ ছিল শাড়ির কাঁটা বাছা। মাঠে সপ্তাহে একদিন হাট বসত তাতে নানারকম দেহাতি জিনিসও পাওয়া যেত। শালপাতায় টক-মিষ্টি লটকা ফল কিনে খেতাম।

একবার কলকাতা থেকে দিদির কয়েকজন বান্ধবী এল চা-বাগান দেখতে। কয়েকদিন বেশ হৈহৈ করে কেটে গেল। ঠিক হল দার্জিলিং যাওয়া হবে। দিদির বন্ধুরা, আমরা বোনেরা আর মা - পুরো প্রমিলাবাহিনী। দার্জিলিং ঘুরেটুরে ফেরার পথে বিপত্তি ঘটল। টয়ট্রেনে উঠেছিলাম, কিছুদূর গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন থেমে গেল। লাইনে ধস নেমেছে ট্রেন আর যাবে না। বেরিয়ে এসে একটা ল্যান্ডরোভার ভাড়া করা হল। সড়কপথে যাওয়া হবে। বেশ কিছুটা গিয়ে দেখা গেল পাহাড় থেকে মাঝেমাঝেই পাথর গড়িয়ে পড়ছে রাস্তায় - আগেপিছে গাড়ির লম্বা লাইন। পাথর পড়ার সাময়িক বিরতির সময় পুলিশ একটা-দুটো করে গাড়ি যেতে দিচ্ছে। আমাদের যখন পালা এল পুলিশ হাত দেখাবার আগেই আমাদের অধৈর্য্য চালকটি গাড়ি স্টার্ট করে দিল। তারপর যে কী হল- একটা আওয়াজ ও ঝাঁকুনি - পাথর পড়ায় গাড়িটা খাদের কাছাকাছি বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে গিয়েছে। পুলিশ ও লোকজনের সহায়তায় হাঁচোড়পাঁচোড় করে গাড়ি থেকে বেরোলাম। চালকটি সঙ্গত কারণেই পুলিশের বকুনি-চড়থাপ্পড় খেল। গাড়ি ঠিকঠাক করে রওনা দেওয়া হল। ভাগ্য সহায় ছিল, অল্পের জন্য সেবার রক্ষা পেয়েছিলাম।

১৯৬৮র অক্টোবর, লক্ষ্মীপূজার আগাম প্রস্তুতি শুরু হয়েছে কিন্তু দু'দিন ধরে বৃষ্টি পড়ায় করলার জল বাড়ছিল। ক্রমশঃ উঠোন পেরিয়ে জল ঘরে ঢুকতে শুরু করল। করলার বন্যায় আমরা কমবেশি অভ্যস্ত ছিলাম। জিনিসপত্র উঁচু জায়গায় তোলা শুরু হল। ধীরে ধীরে জল বাড়তে লাগল। পাড়ার ছেলেরা এসে আরো অন্যান্য পরিবারের সাথে আমাদের পাড়ারই একটা উঁচু বাড়িতে নিয়ে গেল। তখন দোতলা বাড়ি কমই ছিল। প্রকান্ড উঁচু একতলা বাড়ি। কিন্তু সেখানেও জল ঢুকতে শুরু করল। নিমেষের মধ্যে গোড়ালি থেকে কোমর অবধি জল উঠে গেল - ভয়ে কান্নাকাটি, চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। প্রকান্ড ছাদ কিন্তু ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি নেই। ভাগ্যক্রমে মিস্ত্রিদের বাঁশের ভারা পাওয়া গেল, তাই দিয়ে সবাইকে ছাদে তোলা হল। তিনদিন ছাদে ছিলাম - চারিদিকে থইথই জল - নদীর পুলগুলো ওল্টানো তক্তপোষের মতো ভেসে যাচ্ছে, আমাদের বেতের সোফাটা চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, পাশের বাড়ির এ্যালশেসিয়ন লুসি কাঠের কিছুর ওপর বসে ভেসে যাচ্ছিল এবং মালিকদের ডাক শুনে ওই অবস্থায়ও লেজ নাড়াচ্ছিল। শুনেছি যে লুসি কোনো গাছে উঠে বেঁচে গিয়েছিল। জল যেমন দ্রুতবেগে উঠেছিল গ্রাম শহর ভাসিয়ে দ্রুতবেগে নেমেও যেতে লাগল। আমরা ছাদে ওঠার সময় প্রাণভয়ে ভারা বেয়ে উঠে গিয়েছিলাম নামার সময় আর নামতে পারি না। কোনোমতে নামা হল। জলে, পলিতে, কাদায়, জঞ্জালের স্তূপে, গবাদি পশুর মৃতদেহে শহর একদম নরকের রূপ নিয়েছে। রাত্তিরটা পি ডব্লিউ ডি অফিসে থেকে পরদিন শিলিগুড়িতে যাওয়ার কথা ভাবা হল। কিন্তু নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে বাস বা গাড়ি ধরতে হবে, পুল তো সব ভেসে গিয়েছে

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

যাব কীভাবে। ইত্যবসরেঃ মিলিটারি নামানো হয়েছে। নদীর ওপর মিলিটারি বোট দিয়ে অস্থায়ী সেতু বানিয়ে ওরা আমাদের নিরাপদে নদী পার করালো। শিলিগুড়িতে গেলাম এক পরিচিত বাড়িতে, পরে সেখান থেকে আমাদের এক মামা এসে চা-বাগানে নিয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছিল। বার্ষিক পরীক্ষা বন্যার কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুলের হোস্টেলে ভর্ত্তি হলাম। তখন হোস্টেল ছিল রূপশ্রী সিনেমা হলের কাছে 'নূরমঞ্জিল' নামে প্রাসাদোপম একটা বাড়িতে। হোস্টেলের নিয়ম বেশ কড়া ছিল। সবচেয়ে কষ্ট হতো ভোর পাঁচটায় উঠে, কনকনে ঠান্ডায় একতলায় নেমে শ্বেতপাথরের ঠান্ডা সিঁড়িতে বসে 'তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিনমর্ম মুছায়ে..' গানটি গাওয়া।

পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে এলাম। ঠিক হল জলপাইগুড়ির পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়া হবে। ভীষণ মনখারাপ লাগছিল - এই শহর, চা-বাগান, স্কুল, পাড়া, বন্ধুবান্ধব সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। যথাসময়ে স্টীমারে গঙ্গা পেরিয়ে (তখন ফরাক্কা সেতু হয় নি) কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। নতুন স্কুলে ভর্ত্তি হলাম। প্রথম প্রথম কিছুই ভাল লাগত না। নতুন পরিবেশ, সব কিছুই অন্যরকম।

সময়ের সাথে সাথে সবই সয়ে গেল। ধীরে ধীরে কলকাতাবাসী হয়ে গেলাম।

অলঙ্করণঃ স্বাগতা পাল

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

একটি স্মার্ট কবিতা

চন্দন খাঁ

হাওড়া ব্রিজের নীচে শুয়ে আছে
নাম না জানা এক বৃদ্ধ দম্পতি
তিনদিন তারা শুধু শহরের ধুলো খেয়েছে
আর খেয়েছে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস।
শিলিগুড়ি জুড়ে প্রচুর শপিংমল
স্মার্ট ছেলেমেয়েরা সেখানে
চাউমিন খায় আর সেলফি তোলে

আমরা কতখানি স্মার্ট
ফেসবুক জুড়ে নিরন্তর চলে
তারই হাস্যকর প্রতিযোগিতা

আমরা সবাই গ্রাম ভুলে গেলাম
সারল্য ভুলে গেলাম
সম্পর্কের ওম নিতে ভুলে গেলাম

এক সম্পর্ক ভেঙে
ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের রেনকোটে
ভিজতে থাকল আমাদের প্রেম

আমরা এতটাই স্মার্ট যে
আমাদের অশ্রু মুছে দিতে
কোনো আঙুল আর এগিয়ে আসে না

স্মার্টফোনেই আমরা দুঃখ মুছতে শিখে গেছি।

ভালোলাগা

ফরিদা হুসেন

ভাললাগে কাঞ্চনজঙ্ঘায় শ্বেত ও শুভ্র অপরূপ শোভা,
হিম-শীতল পরশমণির হাওয়ায় তোমাকে কাছে পাওয়া।
কনকনে ঠান্ডায় গরম কাপড়ে ও হাতে গরম কফিতে
চুমু,
রামধনু রঙে তোমাকে পাশে নিয়ে ভোরের সূর্যোদয়ে
ঘুমু।

ভালোলাগে পাহাড়ি রাস্তায় আঁকাবাঁকা পথে তোমার
কোলে মাথা,
জানালার কাঁচে ঘন কুয়াশায় তোমার ছবি আঁকা।
রিমঝিম শিশিরের টুপটাপ শব্দে ঝুল বারান্দায় খবরের
কাগজ হাতে,
আরাম কেদারায় দু'জনে হাতে হাত রেখে বসে
একসাথে।

ময়ুর ময়ুরীর পেখম তুলে নাচ - রেললাইনের পাশে,
পরিযায়ী পাখির ঝাঁক ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য দেখতে
কাছে।
বন বস্তির বাসিন্দাদের দলবেঁধে লোকসংস্কৃতির প্রাচীন
দৃশ্য,
আরো ভালো লাগে সহজ সরল কচিকাঁচাদের ভুবন
ভুলানো হাসির সাদৃশ্য।

ভালোলাগে ওই দূরে তোমার হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটা,
অপলক মনে তুমি কি সেই পরখ করতে নিজের
হাতেই চিমটি কাটা।
জন কোলাহল থেকে পাহাড়ী নদীর বড় পাথরে বসে,
আজও আমি বেঁচে আছি তোমাকে ভালোবেসে।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সম্প্রদান

সোমা বিশ্বাস

তৃনা আজ খুব ব্যস্ত, প্রচুর কাজ ওর, বাড়িতে বিয়ে বলে কথা, সব কাজ নিজে দায়িত্ব নিয়ে করছে। তাছাড়া ও না করলে কাজ গুলো করবেই বা কে? ঠাম্মির তো বয়স হয়েছে অনেক কিন্তু নিয়ম নিষ্ঠার বিন্দুমাত্র হেরফের হলে চলবে না। একবার রান্নার ঠাকুরের দিকে দেখতে হচ্ছে, একবার বাড়ি সাজানোর সরঞ্জাম দেখতে হচ্ছে, ভাগ্যিস সোমের কথা মেনে রাতের সমস্ত আয়োজনের দায়িত্ব ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের হাতে দিয়ে দিয়েছিলো। সোমের নাম মনে আসতেই মনটা আজকাল আনন্দে ভরে ওঠে, একটু যেন লজ্জাই পায় তৃনা, কেন যে হয় এমন?

সোমরাজ, ওদের কলেজেই পড়তো, দুই বছরের সিনিয়র, প্রায় বছর নয়েক আগে কলেজ শেষ হতেই কোথায় যেন হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেছিলো। হঠাৎ ছয় মাস আগে তৃনার কোম্পানিতে ওর ঠিক ওপরের পদেই যোগ দিয়েছে। তৃনা তো প্রথমে চিনতেই পারেনি সোম নিজে যেচে এসে পরিচয় দিয়েছিলো,

কিরে তৃনা চিনতে পারছিস না আমায়?
সরি স্যার, চিনতে পারছি না।
মনে অনেক দ্বিধা নিয়ে বলেছিল তৃনা।

আরে আমি তোদের সোমদা, তোদের দু'বছর সিনিয়র ছিলাম, ইউনিয়ন করতাম, আরে তোদের ব্যাচের স্নিগ্ধার সাথে প্রেম করতাম। শেষের কথাটা বলার সাথে সাথে তৃনার সব মনে পড়ে গিয়েছিল, খুব ভালো সম্পর্কও ছিলো সোমদার সাথে ওর। বলেছিল, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে, এতদিন তোমার কোনো খোঁজ পাইনি। তুমি তো কোনো যোগাযোগই রাখলে না।আর বলিস না, তোর বন্ধু এমন দাগা দিলো।

সোমের কথা বলার ধরণে দুজনেই হেসে উঠেছিলো, সেদিনের পর থেকে ওদের মধ্যে একটা জড়তাবিহীন বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিন্তু কয়েকদিন ধরে তৃনা একটা চোরা টান অনুভব করে সোমের প্রতি, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি, কাউকে সেটা বলে বোঝানো যাবে না।

পুরানো কথা বিভোর হয়ে ভাবছিলো তৃনা, এমন সময় ওর পিঠে হালকা স্পর্শ অনুভব করে পেছনে তাকিয়ে ওর হৃৎপিন্ডের রক্ত ছলাৎ করে উঠলো... এতক্ষন যার কথা ভাবছিল সে একদম সামনে এসে দাঁড়ালে ও আর কি করবে।

কি রে কি হ'ল? অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন?
সোম চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।
কই না তো, কিছু দেখছি না তো, তুমি হঠাৎ এখন এখানে? কিছু হয়েছে বুঝি?
বিয়ে বাড়িতে এসে এতো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে জানলে আসতাম না।
আরে না না, তোমার তো সন্ধ্যায় আসার কথা তাই বললাম।
বিয়ের কনেকে দেখতে এলাম, দেখা করা যাবে?
তৃনা মিষ্টি হেসে বললো,
চলো কিন্তু কনে তো লজ্জায় রাঙা হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছে।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

তৃনা আর সোম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময়ই ঠাম্মির গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো,

আরে কি হোলো দরজাটা খোল পিয়া, ঠাকুর মশায় এখুনি চলে আসবে, তোর লাল পেড়ে শাড়িটা তো আমার ঘরে। ভেতর থেকে উত্তর এলো, আমি তো তোমাদের বলেছিলাম এতো বাড়াবাড়ি না করতে তা কি শুনেছ তুমি আর তোমার আদরের নাতনি? ততক্ষনে তৃনারা পৌঁছে গেছে দরজার সামনে, ওদের দেখে যেন বৃদ্ধা বুকে বল পেলেন, তৃনার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ তো দিদি তোর মায়ের কান্ড, কখন থেকে ডাকছি কিছুতেই দরজা খোলে না, ঠাকুরমশাই এলেন বলে।

তৃনার খুব হাসি পেলো ঠাকুমার এই অসহায় মুখটা দেখে, খুব কষ্ট করে হাসিটা আটকে দরজার কড়া নেড়ে বললো, মা তুমি যদি এক্ষুনি না বেরোও তাহলে কিন্তু দরজা ভাঙার লোক ডেকে আনবো। ওষুধে কাজ হ'ল, বন্ধ দরজা খুলে বেড়িয়ে এলো আজকের বিয়ের কনে, তৃনার মা পিয়ালী। খুব ভালো করেই পিয়ালী জানে ওর এই ডাকাত মেয়ের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব, তা না হলে সমস্ত লোকলজ্জা উপেক্ষা করে এই বয়সে কেউ জোর করে মায়ের বিয়ে দিতে পারে, তাও এতো ধুমধাম করে? কবে যে ছোট্ট তৃনা পিয়ালীর মা হয়ে গেলো বুঝতেই পারেনি পিয়ালী। মুখে কোনো কথা না বলতেই বুঝে যায় পাগলিটা।

বাইরে বেরিয়ে সোমকে দেখে পিয়ালী লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে দেখে সোম নিজে থেকেই নিচে নেমে এলো। ও তৃনার কাছেই শুনেছে ওর ছেলেবেলার স্মৃতি কি ভয়ানক, রোজ রাতে ওকে মায়ের কাছ থেকে ছুটে চলে যেতে হতো ঠাম্মির কাছে কারণ সারা রাত বাবা মায়ের ঝগড়া হতো। ও তো নিজেই শুনেছে ওর বাবা সবসময় ওর মাকে বলতো যে তৃনাকে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, বাবা নিতু আন্টিকে বিয়ে করবে। কখনো কখনো ওর বাবা তো মারতো ওর সহজ সরল মাকে। তবু ওর মা চলে যেতো না শুধু ওর আর ঠাম্মির মুখের দিকে তাকিয়ে। শেষমেষ ঠাম্মিই একদিন সাহস করে ওর বাবাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল আর বলেছিল, মা-কে ডিভোর্স দিয়ে দিলে তবেই দাদুর সম্পত্তির ভাগ দেবে, বাবাও রাজি হয়ে গেল আর তারপর থেকে এই বাড়িতে শুরু হ'ল তিন নারীর সংসার, সেও তো প্রায় কুড়ি একুশ বছর আগের ঘটনা। তারপর ওর মা একটা খুব সাধারণ একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে আর ঠাম্মির জমানো টাকা দিয়েই ওদের সংসার চলতো।

ওই কোম্পানিতে চাকরি করার সময়ই পিয়ালীর পরিচয় হয় অভিষেকের সাথে, দুজনের বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু কেউ কোনোদিন নিজের মনের কথা বলেনি একে অপরের কাছে। পিয়ালী তো বরাবর এড়িয়েই চলেছে নিজের মনের কথা, কিন্তু তৃনার বুঝতে অসুবিধা হয়নি এই দুটি মানুষ মনের দিক দিয়ে কতোটা নিজেদের কাছাকাছি। তৃনা প্রথমে কথাটা বলে ওর ঠাম্মিকে যে ও নিজের মায়ের বিয়ে দিতে চায়, ও ভেবেছিলো ঠাম্মির কাছ থেকে খুব বড়োসড়ো বাধা আসবে কারণ হাজার হোক মানুষটা তো পুরনো দিনের, নিজের ছেলের বৌয়ের বিয়ে অন্য কারো সাথে মানবে না কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে ঠাম্মি বলেছিলো, আমি তো কতবার বলেছি পিয়াকে নতুন করে সংসার করতে কিন্তু ও রাজি হয়নি পাছে তুই কষ্ট পাস। এখন তুইও যদি এটাই চাস তাহলে আমি তোর সাথে আছি।

বিয়েবাড়ি ভর্তি লোকের সামনে বেনারসী পড়ে, গয়না পড়ে নতুন বউ সেজে যেতে খুব লজ্জা করছে পিয়ালীর তবে মনের ভিতর নতুন জীবনের আনন্দও উঁকি দিচ্ছে। অভিষেকের চোখে না বলা ভালোবাসার প্রমান পেয়েছে বহুবার, আজ সেই ভালোবাসা বাস্তবে আসবে ওর জীবনে, ভেবেই বুকটা দুরুদুরু কাঁপছে। একটু পরে তৃনা এসে মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেলো বিয়ের আসরে সেখানে অনেকেই খুশি, অনেকে অবাক আবার অনেকেই কৌতুহলী চোখে তাকিয়ে দেখছে পিয়ালীকে আর ও লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে,

তুই কি করেছিস তিনি দেখ... সবাই কেমন হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

হুম, সবাই দেখছে আমার মাকে কতো সুন্দর লাগছে।
বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলো, ঠাকুরমশাই বললেন,
কন্যা সম্প্রদান কে করবে আসুন?
মামা দাদু এসো।

তৃনা পিয়ালীর মামাকে ডাকলো। উনি উঠে এসে তৃনার ঠাম্মির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, দিদি বলুন আপনি কি চান? আমি তো আপনার সাথে একশো শতাংশ সহমত। ঠাম্মি তৃনাকে কাছে ডেকে ওর হাত ধরে বললেন, দিদিভাই আমি আর তোমার মামা দাদু চাই তুমিই তোমার মায়ের সম্প্রদান করো। এই কথার সাথে সাথেই বিয়ের মণ্ডপে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো, পুরোহিত মশাই বললেন, তা কি করে হয় মাসিমা? মেয়ে কিভাবে মায়ের কন্যা সম্প্রদান করবে? কেন ঠাকুরমশাই, মেয়ে যদি নিজে উদ্যোগ নিয়ে মায়ের বিয়ে দিতে পারে তাহলে সম্প্রদান করতে পারবে না কেন? যা দিদিভাই তোর কাজ সম্পন্ন কর। তৃনার কাজল আঁকা চোখ জলে ভরে গেল, ও ভাবতেই পারছে না ঠাম্মি এই কথা বলছে কারণ ঠাম্মি তো চিরদিন সমস্ত নিয়ম মেনে চলার পক্ষে, ও জড়িয়ে ধরলো ওর জীবনের আধুনিকতম মানুষটিকে। ঠাম্মির চোখেও জল, দিদিভাই তুইই তো চিরদিন আমার এই সরল মেয়েটিকে মায়ের মতো আগলে রেখেছিস, তাই শুধু তোর অধিকার আছে ওকে অন্যের হাতে সম্প্রদান করার। যা আর দেরি করিস না, লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

তৃনা গুটিগুটি পায়ে গিয়ে বসলো। জল ভরা চোখে সব মন্ত্র উচ্চারণ করল, তারপর অভিষেক আঙ্কেলের হাত ধরে বলল, আঙ্কেল আমি কন্যা সম্প্রদানে বিশ্বাস করি না, কন্যা তো আর জিনিষ নয় বলো, আমি আজ তোমার হাতে আমার সমস্ত দায়িত্ব সম্প্রদান করলাম, আমার মায়ের যেসব স্বপ্ন আমি পূর্ণ করতে পারিনি সব পূরণের দায়িত্ব তোমাকে সম্প্রদান করলাম, আমার মায়ের চোখে যেন কোনোদিন দুঃখের কান্না না আসে তার দায়িত্ব সম্প্রদান করলাম, তুমি পারবে তো এইসব দায়িত্বের ভার নিতে?

পারবো। কথা দিলাম।
অভিষেক তৃনার হাতের ওপর হাত রেখে বলল।
আমার মাকে আর কষ্ট পেতে দেবেনা, খুব ভালো রাখবে, কথা দাও।
দিলাম।

তৃনা নিজেকে আর সামলাতে পারল না, কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেলো মণ্ডপের বাইরে। পিঠে উষ্ণ হাতের স্পর্শ পেয়ে পেছন ফিরে তৃনা দেখলো সোম দাঁড়িয়ে আছে, এই পাগলী কাঁদছিস কেন? আচ্ছা শোন্, তুই তো কন্যাদানে বিশ্বাস করিস না কিন্তু পাত্র দানে কি বিশ্বাস করিস? মানে? তৃনা অবাক চোখে তাকালো। সোম একটু মাথা চুলকে বললো, মানে, সবাই বলে আমি নাকি পাত্র হিসাবে খারাপ নই, তা আমি যদি নিজেকে তোর হাতে সম্প্রদান করি, তুই কি গ্রহণ করবি? তৃনা লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলো, সোম দু'হাত বাড়িয়ে তৃনাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললো,

আমি উত্তর পেয়ে গেছি।
বিয়ের আসর থেকে তখনো বিয়ের মন্ত্র ভেসে আসছে।।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ওয়াল আর্ট

সংঘমিত্রা দে

দিন সাতেক হলো নতুন ঘরে শিফ্ট করেছে আহেরীরা। বিয়াস একজন হোটেলিয়র। দু'বছর বিদেশে কাটিয়ে পাকাপাকি ভাবে দেশে ফিরে এসেছে গোয়ার একটি আন্তর্জাতিক মানের সেভেন স্টার হোটেল কাম রিসর্টের দায়িত্ব নিয়ে।

পন্ডার সবথেকে পুরোনো আর বিখ্যাত পোর্তুগীজ হোটেল "মিয়া মার" এর খ্যাতি ও চাকচিক্য চোখে পড়ার মতো। এদের চেইন বিজনেস ছড়িয়ে আছে পুরো গোয়া জুড়ে। "মিয়া মার" এই পোর্তুগীজ শব্দের বঙ্গানুবাদ করলে হয় 'আমার সমুদ্র'। যথার্থ নামকরণ বটে, প্রায় প্রতিটা বীচেই এদের এলাহী রিসর্ট আছে। এই হেন কোম্পানির একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার হিসেবে কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি মনের মতো ফ্ল্যাট বিয়াস অনায়াসেই পেতে পারত, কিন্তু ইচ্ছে করেই নেয় নি। আসলে ছোট থেকেই ওর স্বপ্ন ছিল নিজের বাড়ির। আহেরীকে সেকথা আগেই জানিয়েছিল।

এতদিন পর সেই স্বপ্নপূরণের দিন। পন্ডা থেকে পনেরো মিনিটের দূরত্বে লা ডেলা মার্টের কাছে কিছুটা পাহাড় ঘেরা নিরিবিলি পরিবেশে ওদের একতলা বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে ইউক্যালিপটাসের সারি। সামনে বেশ খানিকটা জায়গায় ঘন ঘাসের গালিচা চোখ জুড়িয়ে দেয়।

ঘরটার ডাইনিং স্পেসের দেওয়ালে একটা ৬ ফুট বাই ৬ ফুটের ওয়াল আর্ট ঘরটার আভিজাত্য বাড়িয়ে তুলছে। একজন সুদর্শনা ঘাড় কাত করে সারেঙ্গী বাজাচ্ছে। পায়ে সোনার আঙ্গোট, তাতে লাল পাথর বসানো। পরনে লাল পাড় সাদা জমির কাঞ্জিভরম।

শিল্পী বহু যত্নের সাথে, নিখুঁত নৈপুণ্যে ছবির এক-একটি বাঁক ফুটিয়ে তুলেছে । ছবিটিতে সব থেকে মোহময়ী মেয়েটির চোখ। যেন কোনো অব্যক্ত ব্যথায় ভরা, উদাসীন। যতবার ওয়াল আর্টটার দিকে তাকিয়ে থাকে ততবারই আনমনা হয়ে পড়ে আহেরী। ভারী অস্বস্তি হয়। স্পষ্ট অনুভব করে এক অজানা কষ্টে তার শরীর ভারী হয়ে আসছে।

বিয়াস তুমি বিশ্বাস করবে না জানি - তবু, আমি বলছি এই বাড়িতে কিছু একটা অন্যরকম আছে। এর আগেও ঘটেছে আমার সাথে। এখানে আসার পর পরই। আমি সেদিন বেডরুমটা সাজাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাথরুমের দরজাটা জোর শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমটা গুরুত্ব না দিলেও একটুপর বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে ধাক্কানোর আওয়াজ পাই বারবার। আমি যখন দেখতে গেলাম, দেখি দরজাটা খোলা। তারপর গতকাল ভোরে আমি প্রভাতী রেওয়াজের আওয়াজ শুনেছি বাগানের দিকে। তারপর চাপা গোঙানির আওয়াজ কান্নার মতো। এত তাড়াহুড়া করে ঘরটা না কিনলেই পারতে - আহেরীর গলায় পরিষ্কার হতাশা প্রকাশ পায়।

বিষয়টাকে একেবারেই আমল দিতে নারাজ বিয়াস। এত কষ্ট করে ঘরটা সে কিনেছে। একথা সত্যি যে তুলনামূলক দামটা অনেকটাই কম পড়েছে। তাই বলে ভূতুড়ে একথা মানা যায় না। এই নিয়ে দু'দিন স্বামী স্ত্রীতে বেশ কথা কাটাকাটি চলেছে।

অফ মরসুমে ট্যুরিষ্টের চাপটা একটু কম থাকে, তাই দু'দিন ছুটি নিয়েছে ও। সন্ধ্যের দিকে বাড়ির সামনের লনে ঘোরাঘুরি করছিল। হঠাৎ খুব মিষ্টি রেওয়াজী কণ্ঠে ভেসে আসে - "ছাপ তিলক সব ছিনি রে মো সে ন্যায়না মিলাইকে"

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

অস্থির হয়ে পড়ে বিয়াস। আহেরী গান জানে তবে এটা আলাপী কণ্ঠ। অন্যরকম মাধুর্য আছে। খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির পেছন দিকটায় চলে এসেছে ও। হঠাৎ মনে হল অন্ধকারে মিশে কেউ বসে আছে। মনের ভুল কিনা সেটা দেখতে আরো একটু এগোতে যাবে তার আগেই জোর একটা হ্যাঁচকা টান পেছন থেকে। আহেরী ওকে টেনে ধরে আছে।

"কী করতে যাচ্ছিলে? ওদিকে ঢাল বেয়ে সোজা খাদ নেমেছে নীচে ভুলে গেলে। আর বাড়ির এইপাশের প্রাচীর তো ভাঙা আছে, এখানে কী করছিলে?"

আহেরীর গলায় পরিষ্কার ভয় ধরা পড়ছে। ভয়ের চোরাস্রোত গ্রাস করেছে বিয়াসকেও। কিন্তু এখানেই শেষ হল না সবকিছু। আরো বড় ধাক্কাটা বাকি ছিল ওদের জন্য। রাত তখন এগারোটা প্রায়। সারাদিন নানারকম মানসিক চাপে দু'জনেই বেশ কাহিল। বিছানায় একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে যখন পরস্পরের উষ্ণ আলিঙ্গনে ওরা আশ্রয় খুঁজছিল, ঠিক তখনই আয়নার দিকে চোখ পড়ে যায় বিয়াসের। বিস্ময়ে, ভয়ে ওর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না। আহেরীর চোখও সেদিকে গেল। কিন্তু এ কী দেখছে ওরা! আয়নায় ওয়াল আর্টের মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। চুলগুলো বিস্রস্ত, কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। ঠোঁটের কোণেও জমাট রক্ত। জামা, শাড়িতেও রক্ত লেগে আছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। আহেরী হাতের কাছে জলের জগটা ছুঁড়ে মারল আয়নাটায়। বেলজিয়াম কাঁচের ভারী আয়নাটা খানখান শব্দে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তাও আধ-ভাঙ্গা টুকরো টুকরো অংশে সেই ভয়ানক মুখ ভেসে উঠতে লাগল।

আহেরী পাগলের মতো ছুটে গেল ডাইনিং রুমে। ওয়াল আর্টটার গায়ে আঘাত করতে লাগল। হাতের কাছে যা ছিল তাই দিয়ে মারতে লাগল চিৎকার করতে করতে। সে দৃশ্য দেখার মতো নয়। বিয়াসের আয়ত্তের বাইরে তখন ওকে সামলানো। এক পর্যায়ে গিয়ে দেয়ালের রঙ চটে অনেকখানি রঙিন পলেস্তারা খসে পড়ল আর আশ্চর্যজনকভাবে দেয়ালের ভিতরে আরো একটি চোরা স্থান হাঁ মুখ বের করে এল।

বাকি ঘটনাটা পরের একমাস ধরে ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলগুলোর ট্রেন্ডিং টপিকস ছিল। সেই রাতে বিয়াসদের ঘরে উন্মোচিত হয়েছিল বছর দুয়েক আগের এক বীভৎস নারকীয় হত্যার। ধরা পড়েছিল মহারাষ্ট্রের এক বিখ্যাত মন্ত্রীর পুত্র তার বাগদত্তাকে খুন করার দায়ে।

বিশালাক্ষী দেশমুখ ছিল একজন উঠতি গায়িকা। ভীষণ সুন্দর কণ্ঠ তায় সুন্দরী। শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে ততই সন্দেহের পারদ চড়তে থাকে সম্পর্কে। দীপ্তেশ পাতিল বেশি দিন দেরী করে নি তার প্রেমিকাকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। প্রেমের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে সবকিছু থেকে তাকে দূরে নিয়ে গেছিল। কিন্তু আসলে সে ছিল সন্দেহ রোগগ্রস্থ।

মহারাষ্ট্র থেকে দূরে গোয়ায় গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। বিনা কারণে প্রচন্ড মারধর করত বিশালাক্ষীকে।

বাথরুমে বন্ধ করে রাখত। প্রেমের নিদারুণ চিহ্ন সারা শরীরে সাজানো ছিল মেয়েটার। শুধু তার নীরব চোখের জলের সাক্ষী ছিল এই ঘরটার প্রতিটা দেয়াল। একদিন দীপ্তেশের আড়ালে একটু গানের রেওয়াজে বসেছিল মেয়েটা। এমন সময় দীপ্তেশ এসে পৌঁছায়। ওর ধারণা ছিল গান করলে ওকে বিশালাক্ষী ভুলে যাবে। রাগে অন্ধ হয়ে প্রচন্ড মারতে থাকে। শেষে কখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল মেয়েটি। যেহেতু প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে ছিল তাই বিষয়টা ধামাচাপা পড়ে যায়। দেহ লোপাট করতে গেলে ঝামেলা হতে পারে তাই ডাইনিং রুমের দেয়াল কেটে বিশেষ ভল্টে দেহটা রেখে আবার নতুন করে দেয়ালটা তৈরি করা হয় আর বিশালাক্ষীর একটা পোট্রেট ওয়াল আর্ট করে দেওয়া হয়।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

দোষীদের শাস্তি হয়েছিল হয়ত। কিংবা কতটা হয়েছিল সে বিষয়ে আগ্রহ ছিল না বিয়াসদের। কিন্তু সবচেয়ে অবাক লেগেছিল যখন ভল্ট থেকে বিশালাক্ষীর দেহটা বার করা হয় তখন তা একেবারেই অবিকৃত। এতটুকু পচন ধরে নি দু'বছরে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল এই মেয়েটার এত দুঃখের জীবন ছিল। প্রেমের শিকল পড়িয়ে ওর সবটা নিঃশেষে কেড়ে নিয়েও শেষ রক্ষা হয় নি। আহেরী যখন পাগলের মত ওয়াল আর্ট নষ্ট করছিল তখন একবার বিয়াসের নিজেরই মনে হয়েছিল এত গায়ের জোর ওর এল কিভাবে। এখন বুঝতে পারছে আসলে আহেরীর ভয়ের সাথে বিশালাক্ষীর মরিয়া চেষ্টা যুক্ত হয়েছিল খুনীদের ধরিয়ে দিতে।
ডাইনিং রুমের দেয়ালে তারপরও আরেকটা ওয়াল আর্ট তৈরি করিয়েছে আহেরী। নীল আকাশ আর খাঁচা ভেঙ্গে উড়ান লাগানো দুই বন্ধনহীন পাখি।

মোহ

তনুকা জোয়ারদার রক্ষিত

অবিরাম সাংসারিক মন আর চেতনায় নিত্যকার আসা-যাওয়া,
ভাবোনি কখনও এ ঘর-সংসার তোমার নয়,
তিলতিল করে গড়ে তোলা সহ-সাথীর পরিচর্যায়,
একদিন 'সুখের-প্রাসাদ' গড়েছিলে।
একটু একটু করে সম্পর্কের ভিত গড়ে তুলেছিলে,
হঠাৎই ঠুনকো হয়ে পড়ে সমর্পণের চেতনা।
এক মুহূর্তেই ধূলিস্যাৎ তোমার স্বপ্নের গড়।
মিথ্যে মনে হয়, অসাড় গোটা পৃথিবীর আলোক-মালা।
কখন তোমার বন্ধন তার রুদ্ধশ্বাস লেগেছিল,
সে নিজেও জানতো না।
এক 'মোহাচ্ছন্ন' আবেগে গা ভিজিয়ে তোমার আপন হ'ল পর।
তুমি হলে সম্পূর্ণ 'একাকিনী'।
আজ চমকে উঠে দেখলে সবই ফাঁকা আস্তরণে ঢাকা।
কি অসাধারণ খেলা খেললো তোমার সাথে,
বোকা তুমি। আসলে সৎ, নিরুত্তাপ সরলতায় তুমি
ভাবতেই পারো নি, সম্পর্কের মিথ্যে আঁটুনি।

যুদ্ধজয়ের শেষে

পরাগ মিত্র

শেষ শত্রু নিহত হলে ক্রোধ ম্রিয়মাণ হয়;
তার আঁজলাভরা ক্লান্ত শ্বাসের স্পর্শবিন্দু ছুঁয়ে
স্বরলিপি লিখে রাখে ভাঙা দেউলের গান।
নির্বাসিত রাত্রি ছেঁচে নামে পর্ণমোচীর ঘ্রাণ,
কুলুঙ্গিতে মৃত দিনের শোক থরে বিথরে সাজিয়ে রাখে
বাবার দাহ দিনে মাধুকরীর ক্ষয়, উনুন জ্বেলে জীবন্মৃত
মা আর ফ্যালফ্যালে সন্ধ্যায় অ্যাম্বাসাডারে মিনির হাত
নেড়ে চলে যাওয়া...

সপ্রশংস রাজপথ উপচে আসা বুম,
উলুধ্বনি হিল্লোল তরঙ্গে ইথারে

ছড়ের কাতরে তবু অবসন্নী ঠাট। নিঃসঙ্গ গান্ডীব একা
শাঁখা ভাঙা তুলসীতলায়।।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

পিঙ্কটুথ

সুরূপা

"সোনাল, গাড়ির চাবিটা দেখেছিস? খুঁজে পাচ্ছি না তো--"

"সাহানা, তু তো আজ উড় রহি হ্যায় -- ইয়ে লে।"

"বাই"

"হ্যাপি জার্নি - সামাহলকে দোস্ত।"

পুনে-মুম্বাই হাইওয়ে ধরে সাহানার গাড়ি ছুটল। সুমনের গান শুনতে শুনতে যেন ফিরে দেখছে '৯৪ কে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে সেই সকাল থেকে - ওয়াইপার বেচারার হাঁফ ধরে গেল।

"পৌঁছে গেছি - এবার বল কোথায় যাবো?"

"আগে গাড়ি থেকে নেমে আসুন ম্যাডাম।"

"তারমানে! কোথায় তুই! আমি তো দেখতে পাচ্ছি না!"

ছাতা মাথায় গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল শ্রমণা। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে! ইশারা করার পর সাহানা গাড়ি থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরল শ্রমণাকে।

"উফ! তোর এই 'উঠল বাই তো কটক যাই'টা আর গেল না।"

"আমি আর চেন্জ হতে পারলাম না রে-"

"কী যে বলিস! তুই তো চেন্জ আনতে চলেছিস - যাকে বলে বিপ্লব - তুই চেন্জ হোস না বন্ধু।"

"দাঁড়া, দ্যাখ কতটা কী হয় - এই বিপ্লবে বিপদ আছে বন্ধু।"

খুঁজে-পেতে একটা সম্পূর্ণ ফাঁকা ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে বসল শ্রমণা আর সাহানা। দু'ঘন্টার জন্য সম্পূর্ণ ক্যাফেটা বুক করে নিল। সেই '৯৯এ শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল, আর এটা ২০৩৭ - সাহানা নিজের আবেগ-উচ্ছাস ধরে রাখতে পারছে না। শ্রমণা দিল্লি থেকে বাগডোগড়া যাচ্ছে ভায়া পুনে - দু'দিনের জন্য কোচবিহারে যাবে কাকাতো বোনের বিয়েতে। পুনেতে ফ্লাইট চেন্জ করতে হবে, মাঝে চারঘন্টার বিরতি - সেই সুযোগটা হাতছাড়া করল না ওরা। সাহানা মুম্বাই থেকে পুনে এসেছে বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

একসময় সবাই ওদের মানিকজোড় বলত। সেসব দিন ক্যালেন্ডারের ড্রাইভেই তোলা আছে। দু'জনের পরিবেশে-পরিস্থিতি আজ প্রায় উল্টোমুখে চলছে ; করম-ধরমও সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রমণা নিজের চাকরি, রিসার্চ সামলে সংসারটাও করে। কলেজের বন্ধু ধৃতিমানের সাথে সময়মতো বিয়েটা সেরে ফেলেছিল। দু'জনেই দু'জনকে খুব ভালো বোঝে - ইন্জিনিয়ারিং পড়ার সময় থেকেই ওরা একসাথে থেকেছে, দু'জন দু'জনের কাজে সাহায্য করেছে। এই রিসার্চের অনেকটাই ধৃতিমান নিজে সামলেছে - নাহলে চাকরির পাশাপাশি এতবড় কাজ শ্রমণার করা মুশকিল ছিল। ওদের মেয়ে দুর্বাকে ওরা দু'জনে মিলেই মানুষ করেছে। আর সাহানার জীবনচর্যা আপাতদৃষ্টিতে বোহেমিয়ান মনে হলেও ওকে ছন্নছাড়া বলা যায় না - জীবনকে ও গুছিয়ে উঠতে পারে নি পারিপার্শ্বিকতার কারণে। অফিস, সোনাল, শ্রমণা - এই হল ওর জীবনের ত্রিভুজ।

সাহানা আর শ্রমণা টেপ-জামা বয়সের বন্ধু। কিলোমিটারের দূরত্বও ওদের সম্পর্কের ভেতরে শ্যাওলা জমতে দেয়নি। মোবাইলে ভিডিও কলের সুবিধে আসার পর থেকে হপ্তা রোববার রাত ন'টা থেকে কল্ শুরু হয় দু'জনের - পেট ফাঁকা না হওয়া অব্দি কল্ চলে, বহুবছরের অভ্যেস। কিন্তু কিছুতেই ওরা সাক্ষাৎ করতে পারছিল না। কতবার, কতবার-যে কী অদ্ভুত সব কারণে সব ভেস্তে গেছে! অবশেষে আজ সেই দিনটি এসেছে।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

"ম্যাডাম কফি - ওউর কুছ?"
"নো, থ্যাঙ্কস।"
ফিসফিস করে সাহানা বলে উঠল, "আমরা তোমার কেদারা দুটোই চাই, ওউর কুছ নেহি চাহিয়ে।"
"তোর ফচকেপানা আর গেল না রে সাহানা! এবার তো একটু ভদ্র হ - পকেট গরম করলেই হবে। "

সাহানা সেনগুপ্ত - কলেজে সবাই ওকে এস এস বলেই ডাকত। আগে পুনেতে থাকত, ২০৩০এ মুম্বাইয়ে চলে আসে পাকাপাকিভাবে। বছর সাতেক ধরে মুম্বাইয়ের বাসিন্দা - সেল্ফ এমপ্লয়েড। সে যাই হোক-না কেন, এতবছর প্রবাসে থেকেও নিজের ভেতরের মানুষটা একই আছে - কাজের বাইরে সাদামাটা-মফস্বল মেয়ে, আবেগে ভরপুর। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। গাইসাল দুর্ঘটনায় বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে সাহানা। রুমমেট সোনালই তখন ওকে ট্রমা থেকে টেনে তুলেছিল। তারপর থেকেই রুমমেট কাম কলিগ সোনাল বাজপেয়ী-ই ওর ফ্রেন্ড -ফিলোসফার-গাইড, যদিও বয়সে অনেকটাই ছোট সোনাল। সামনের মাসে সোনালের বিয়ে, তারপর থেকে সাহানাকে একাই থাকতে হবে। বহুদিন আগেই ঠিক করে ফেলেছিল যে ও বিয়ে করবে না। একটি মেয়ে দত্তক নেবে - যোগাযোগও হয়েছে, প্রসেসিং চলছে।

কফিতে প্রথম চুমুকটা দিয়েই সাহানা শ্রমণার দিকে গোলগোল চোখে বলল, "তা, তোর মাথায় এই কিম্ভূতকিমাকার আইডিয়াটা এল কীকরে, সেটা একটু শুনি?"

"সেসব আর মনে নেই রে -"
বায়নার সুরে সাহানা বলল, "না, বল-না, তুই তো বলেছিলি যে ফোনে বলবি না, দেখা হলে বলবি, দেখা তো হল, এবার বল, বল বলছি-"

শ্রমণা বৃষ্টির দিকে আনমনা-অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "শুরুটা ঠিক মনে নেই, এত বছর আগের কথা। এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, তুই সাজিয়ে নিস।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই তো লিখব তোর স্টোরিটা - বেস্ট ফ্রেন্ড বলে কথা। ইস্, কবে যে ছাড়পত্র পাবে আমার বন্ধুর এই 'পিঙ্ক-টুথ' -"

"ছাড়পত্র পাবে বলে মনে হচ্ছে না রে, সরকার আগ্রহ দেখাচ্ছে না তেমন। তার ওপর রাজনীতি তো আছেই।"
সাহানা প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, "শ্রমণা, বলবি তুই শুরুটা - আর ধৈর্য্য রাখতে পারছি না -"

শ্রমণা বসু রায়, ও-ও কোচবিহারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই সবচেয়ে প্রিয় খেলনা ছিল গাড়ি - তাই ওকে সবাই গাড়িই উপহার দিত জন্মদিনে। অতিথিরা চলে গেলেই রাতে গাড়িগুলো নিয়ে বসত শ্রমণা, একে-একে সব গাড়ির কলকব্জা খুলত, তারপর আবার সেগুলো জুড়ত। অনেকেই ওকে 'ছেলেদের মতো' বলত! তাতে খুব চটে যেত, প্রকাশ করত না। শ্রমণার মা অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানাত, "কেনো গো! খেলার আবার ছেলে-মেয়ে আছে নাকি, নাকি খেলনার লিঙ্গ আছে!" বড় হওয়ার পর অবশ্য শ্রমণা নিজেই মিষ্টি মুখে বুঝিয়ে দিত যে ও মানুষ। শ্রমণার মেয়েও ঠিক মায়ের মতোই হয়েছে - রান্নাবাটি বা পুতুল নয়, ওর নেশা নানানরকম খেলা - দাবা থেকে বাস্কেটবল, সবই ভালো রপ্ত করে ফেলেছে মেয়েটা। শ্রমণা রান্না করতে আর খাওয়াতে খুব ভালোবাসে, তবে আজকাল আর সময়-সুযোগ করে উঠতে পারে না। বড়সড় রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত, সারাদিন ওইসবই ঘোরে মাথায়।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

"বলছি বাবা বলছি। আমি তখন ডি ইউ-তে পি এইচ ডি করছি। ধৃতিমান তখন ন'মাসের জন্য ব্যাঙালোরে ছিল, নিজের কাজে ডুবে থাকত। আমি তো বাড়ি যাওয়ার সুযোগই পেতাম না। বাবা-মায়ের সাথে টানা কথা বলার অবসরও কম হতো তখন। মায়ের আদর, মায়ের হাতের রান্না, মায়ের আঁচলের গন্ধ খুব মিস করতাম। একবার খুব জ্বর হল - প্রায় তিনদিন বিছানায়, কেউ নেই, নিজের কপালে নিজেই জলপট্টি দিচ্ছি, ধৃতিকেও জানাইনি সবটা - ব্যস্ত আছি বলে একটু কথা বলেই ফোন রেখে দিয়েছি। তুই তো জানিস, আমার শরীর একটু খারাপ হলেই বাবা আমার পাশ থেকে নড়ত না। সেইদিন খুব কান্না পাচ্ছিল - বুকে চাপা কষ্ট। মনে হচ্ছিল এক ছুট্টে বাড়ি চলে যাই। যাইহোক, ওষুধের জেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন ব্রেকফাস্ট করে গান শুনব বলে স্পিকারটার সাথে ব্লুটুথ কানেক্ট করতে যাব, তখনই হঠাৎ মাথায় এল এইরকম ব্লুটুথের মতো কোনো মাধ্যম দিয়ে যদি আমি মা-কে ছুঁতে পারতাম, বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে এরকম অনুভূতি পেতে পারতাম, ধৃতিকে একটু জড়িয়ে ধরতে পারতাম তাহলে কী ভালোই-না হতো। ব্যস -- শুরু হয়ে গেল কাটাছেঁড়া।"

"সেই থেকে এই! এই-না হলে আমার বন্ধু-" ব'লে চেয়ার থেকে উঠে সাহানা জড়িয়ে ধরল শ্রমণাকে।
"আচ্ছা শোন, এই ডিভাইসটা আসলে কীভাবে অপারেট করতে হবে - ভালো করে বুঝিয়ে বলতো আরও একবার।"
"মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ জাতীয় ডিভাইস তো নয় এটা - এই ডিভাইসের কাজ শুধু এটুকুই। ধর, তুই তোর ওয়ান এন্ড ওনলি অনির্বাণকে ছুঁতে চাস - সেটা কিন্তু সম্ভব হবে না এর দ্বারা। কারণ অনির্বাণের সাথে তোর দেখা-সাক্ষাৎ বা কোনোই যোগাযোগ নেই বহুকাল, এই ডিভাইস তোকে চিনলেও তোর সাথে অনির্বাণকে কানেক্ট করতে পারবে না। তোর সাথে যার প্রায়ই যোগাযোগ হয় বা হয়েছে, যার গন্ধ-স্পর্শের ইতিহাস তোর রোমকূপে আছে, তাকেই ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবে। নাহলে তো যে-কেউ যাকে-তাকে কানেক্ট করে নেবে, তাই না?"

"ওমা! কী দারুণ ব্যাপার রে শ্রমণা! তুই করেছিস কী!"

"আর যেকোন দোকান বা স্টোর থেকে একখানা ডিভাইস কিনে নিলি, সেটাও সম্ভব হবে না। সরকার রেজিস্টারড স্টোরেই এটা পাওয়া যাবে। তোকে এক জোড়া ডিভাইস নিতে হবে, তুই যার সাথে কানেক্ট হতে চাস তার কাছে একটা থাকবে, আর তোর কাছে একটা থাকবে - সেই দু'জনের ডক্যুমেন্ট সরকারীভাবে সীল-ছপ্পর পেলে তবেই সেই দু'জন এটার সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এবার তুই আর সে যখন দু'জন দু'জনকে 'ইয়েস' করবি, তখনই ডিভাইস কানেকশন দেবে। তারমানে, এই একজোড়া ডিভাইস যে দু'জনের কাছে থাকল, তাদের দু'জনের সম্মতি না পেলে ও কাজ শুরু করতে পারবে না।"

"আচ্ছা বুঝলাম, তার মানে আমি একটা ডিভাইস দিয়ে শুধু একজনকেই কানেক্ট করতে পারব।"
"একদম তাই।"

সাহানা গালে হাত দিয়ে বলল, "ধর, একজন তার বাবা আর মায়ের সাথে কানেক্ট থাকতে চাইলে দুটো আলাদা ডিভাইস লাগবে - তাই তো? প্রচুর খরচা তো ---"

"আগে আমাদের ওদিকের ট্রাকের পেছনে লেখা থাকত মনে নেই তোর 'দেখলে হবে, খরচা আছে', এ-এও তাই বৎস।"
"যাদের একাধিক গার্ল-ফেন্ড বা বয়-ফ্রেন্ড তাদের কথা তুই একবার ভাবলি না শ্রমণা! দিস ইস নট ফেয়ার বন্ধু। "
শ্রমণা সাহানার ইয়ার্কিটা ঠিক ধরতে পারল না - বলল, "আরে, এসব ভেবেই তো ব্যাপারটা জটিল করা। যে কেউ, যখন ইচ্ছে, যাকে-তাকে কানেক্ট করতে পারবে না। যা দিনকাল।"

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ইতিমধ্যে ছ'কাপ কফি শেষ। দু'ঘন্টা পার হয়ে গেছে। ক্যাফে-ম্যানেজার ভুরু কুঁচকে বারবার ঘড়ি দেখছে। "মোদ্দা কথা, যেকোনো ট্রু রিলেশনশিপকে মেইনটেইন করা অথবা হেল্দি রাখার ব্রহ্মাস্ত্র তোর এই 'পিঙ্কটুথ'।" ক্যাফের ওয়েটারকে ডেকে সাহানা কিছু খাবার অর্ডার করল। হাতে আর সময় নেই। এরপরেই আবার শ্রমণাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে সাহানাকে মুম্বাই ফিরতে হবে। সোনাল দু'বার ফোন করে ফেলেছে, "ওয়েদার ভারী আছে, জলদি লওটনা।"
ওয়েটারকে আবার ডাক দিল সাহানা। কেক আছে কিনা জানতে চাইল। "হাঁ জী"।

রেড-ভেলভেট কেক এল, কেকের ওপরে পিঙ্ক ক্রীম দিয়ে লেখা pt অর্থাৎ pinktooth. ওরা দু'জন মিলে কেক কাটল। ক্যাফের চার-পাঁচজন মিলে হাতে তালি দিয়ে বলে উঠল, " হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থ ডে টু pt"

গোপন প্রেম

রূপকথা মৌমিতা মন্ডল

কেন তবে কাছে এসেছিলে?
কেন বেঁধেছিলে বাহুডোরে?
তোমার পরশে প্রশ্রয়ে
স্বপ্নেরা আজও বেঁচে ফেরে।।
উচ্ছল হাসি ছিলে তুমি
দিনরাত কেটে যেত সুরে,
কিছু পথ একসাথে হাঁটা
স্বপ্নেরা আজও নীড়ে ফেরে।।

কিছু পথ হল না যে চলা
কিছু গান এখনো যে বাকি,
তোমারই অপেক্ষায় মন
কিভাবে যে সামলিয়ে রাখি।।

রাত কাটে শত তারা গুনে
উপোসী দু'চোখ খুঁজে যায়,
তোমার শরীরে থাকা গন্ধ
লেগে আছে গায়ের জামায়।।

কিছু কথা পেল না যে ভাষা
একা চাঁদ শুয়ে জ্যোৎস্নায়,
শেষ রাতে ফিরে গেছ মন
স্বপ্নরা একা ভিজে যায়।।

গান বাঁধে মনহীন কায়া
তোমার পথের পানে চেয়ে,
তোমারই চোখের প্রশ্রয়ে
ভালবাসা আজও আছে ছেয়ে।

চলে যাবে যদি ভেবেছিলে
কেন তবে কাছে এলে মন?
কেন বলেছিলে ভালোবাসি?
ভালবেসে যাব আজীবন?

মন দেওয়া-নেওয়া বিনিময়
চাঁদ আজও জ্যোৎস্নায় ভাসে,
সাঁঝবাতি নিভে গেছে কবে
স্বপ্নেরা তবু ফিরে আসে।।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

রঞ্জাবতীর দুপুর
মৌসুমী রায়

শূন্যতার পথে চলতে চলতে
একসময় গন্তব্য শেষ হয়ে যায়,
চেনা অচেনা মুখের ভিড়ে
'ভালোবাসার' মুখ আপনি হারায়।

নির্জন দুপুরে চলে নিজস্ব শব্দের খেলা
আমাকে জাগিয়ে রাখে ঘোরের ভিতর
সদ্য বৃষ্টিভেজা লেবুপাতার গন্ধে বিভোর
একা জানালায় ম্লান হয়ে আসে একলা দুপুরবেলা।

জোনাকীদের ঘুম ভাঙ্গে সন্ধ্যায়
আলোছায়া ঘিরে থাকে ঘরময়
কি করে বোঝাই বিষাদেও
পথ চেয়ে থাকি খোলা দরজায়
'ভালোবাসা' যেন চুপিসারে এসে...
দাঁড়ায় ঠিক আমার পাশটায়।

দীর্ঘ ভাঙনের পর
সুমনা দত্ত

দীর্ঘ ভাঙনের পর আবার নিজেকে গুটিয়ে নিই,
দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায় ফাটলের দাগ!

একটু-একটু করে অবাধ্য ইচ্ছেরা শবদেহ হয়,

বন্ধ দরজার ওপারে শুনি কার যেন দীর্ঘশ্বাস!
কবিতার খাতায় অকাল বৃষ্টি, বালিশ ভেজে,
অথচ বাইরে কোথাও কোনো বেপরোয়া মেঘ নেই।

ভাঙা ফুলদানির মতো অযত্নে পড়ে থাকা শুধু
এককোণে,
একটু-একটু করে ঘুম ভাঙে অপ্রাপ্তির!
শোকের ঘরের অগনিত মিছিলে নতমুখে আমি!
দীর্ঘ ভাঙনের পর নদীও পাল্টে ফেলে গতিপথ,
তেমনি এখন শবকাটা ঘরের মেঝেয় শুয়ে আমি।
জীবনের হিসাব মেলাতে বসে অনায়াসে কেমন
দু'হাতে মুছে ফেলছি আমার ব্যর্থতার ইতিহাস।

বিকেলের ডাক
শতরূপা সান্যাল

যাওয়া আর আসা নিয়ে সমুদ্রতীরের ক্যাসুরিনা
সে বলেছে, "তোমাকে তো চিনি আমি তবুও চিনি না।
বিকেলের সূর্য মেখে যে বাতাস মাঝে মাঝে আসে
আমি জানি গোপনে সে পাতার আদর ভালোবাসে।
তার ভালোবাসাটুকু ক্যাসুরিনা ডালে লেখা থাক
আমি রিক্ততায় শুনি দূর বিকেলের ডাক।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সতীর্থ কথা

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সতীর্থ - এক আবেগের নাম

তন্ময় রঞ্জন দাস

একদিন হঠাৎই ফেসবুক মেসেঞ্জারে একটা টেক্সট আসল, সম্ভবত 2017 এর মাঝামাঝি। প্রিয় আদর্শ বিদ্যাভবনের এক ভাই জানতে চেয়েছে আমি ওদের একটা NGO এর সদস্য হতে রাজি কিনা। এই NGO বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের নিয়ে গঠিত। সম্মতি জানাতে সময় নিই নি, প্রিয় আদর্শ বিদ্যাভবন ও সুন্দরী মালবাজারের গন্ধ পাচ্ছিলাম যে ওই আমন্ত্রণের মধ্যে।

আজ, 2021 শেষ হবার মাত্র কয়েক দিন বাকি, অফিসে কাজ করতে করতে আবার একটা আমন্ত্রণ। এবার ফোন করেছে এক সতীর্থ বোন। সতীর্থর ম্যাগাজিন সাঁকোতে লেখার আবেদন নিয়ে। লেখালেখিতে অভ্যস্ত না, পারিও না বিশেষ। কিন্তু কী করে ফেরাই, আহ্বানটা যে সতীর্থর, তাই যেমনই হোক দু-এক লাইন লিখবই মনস্থির করলাম।

চার বছর আগের এক মেসেঞ্জার টেক্সট এক মাঝবয়সি মধ্যবিত্ত মানুষের মন এত উতলা করে তুলেছিল কেন জানতে হলে একটু পেছন ফিরে তাকাতেই হবে। এক ছোট্টখাট্ট, শ্যামবর্ণ, রোগাপটকা ছেলের কথা একটু বলি। হাওয়াই চটি পায়ে, পরনে খাকি তাপ্পি মারা হাফপ্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথা ভর্তি কালো চুল ছেলেটার সমস্ত চাওয়া পাওয়াই যেন ওই জাহাজ বাড়ি আর তার চারপাশ জুড়ে আবর্তিত হত। ওই মাঠ ছিল তার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, ওই জাহাজ বাড়িতে যারা ওঠা-নামা করতেন তারা ছিলেন তার কাছে নেতাজী, গ্যালিলিও কিংবা নিউটন বা রামানুজন। আর ওই গোলাইটা, যেখানে স্বাধীনতা দিবসে আর প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা তুলে হেডস্যার ধ্বনি তুলতেন " বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ " - সেই গোলাইটা ছিল তার কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগের মত পবিত্র। মাল পার্ক আর তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলা ঝোরাটা ছিল তার নিক্কো পার্ক। সেই ছেলেটা বহুদিন পর যখন চাকুরী সূত্রে দিনহাটা থাকত, তখন প্রায়ই বাড়ি ফেরার সময় জলপাইগুড়ির বাসে উঠতে গিয়ে মালবাজারের বাসে উঠে পড়ত। সহকর্মী বন্ধুরা টেনে নামাত। বিদ্যালয়ের প্রতি, মালবাজারের প্রতি সেই টান, সেই আবেগ এই মধ্য পঞ্চাশেও এক ফোঁটা কমেনি। তাই তো সেদিন ভাই গৌতমের টেক্সট বা আজ বোন সুপর্ণার ফোন একইরকম ভাবে আবেগকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। শুরু হয় সতীর্থ কথা লেখার এই প্রচেষ্টা।

সতীর্থ-এই নামটা আর তার হাতে হাত ধরা লোগোটা দেখলেই বোঝা যায় কি উদ্দেশ্যে পথ চলা শুরু করেছিল সবার প্রিয় এই সংগঠন। শুরুতে খুব সামান্য ক্ষমতা নিয়েই দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বই খাতা দিয়ে সাহায্য করা হত। কিন্তু শুধুমাত্র বইখাতা দিলেই তো দায়িত্ব শেষ হয় না, প্রাথমিকের ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের বসার বেঞ্চ ছিল না। প্রাণ কেঁদে উঠল সতীর্থদের। 20 খানা হাই বেঞ্চ-লো বেঞ্চ দেওয়া হল তাদের। আস্তে আস্তে প্রসারিত হল কার্যক্ষেত্র। আদর্শ, সুভাষিণী ,পুষ্পিকা পার করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হল সমগ্র মালবাজার আর তার চারপাশের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি। বাচ্চাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তাদের দেওয়া হল "স্পোর্টস ইক্যুইপমেন্ট"। শুধু তাই না, বন্ধ চা বাগান বা গ্রামের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীরা যারা শীতে কষ্ট পাচ্ছিল তাদের জন্য দেওয়া হল সোয়েটার। সঙ্গে কখনও খাতা, পেন্সিল, মাস্ক, কিম্বা কখনও বা ছাতা। আমাদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় সুশান্ত স্যার যখন প্রস্তাব দিলেন যে মালবাজারের রাস্তাঘাটে রাত কাটানো যে সকল ভবঘুরে মানুষ প্রচন্ড ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছে, তাদের জন্যও আমাদের কিছু করার প্রয়োজন, ঝাঁপিয়ে পড়ল সতীর্থরা। প্রায় পঁয়ত্রিশ জন এইরকম মানুষের গায়ে তুলে দেওয়া হল কম্বল। এছাড়াও আছে পুরনো বস্ত্র বিতরণ। সতীর্থর সদস্য, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনদের থেকে সংগৃহীত প্রচুর ব্যবহারযোগ্য পুরনো জামাকাপড় বিতরণ করা হ'ল দুঃস্থ মানুষের মধ্যে। প্রয়োজনের তুলনায় সেটা হয়তো খুবই কম, কিন্তু এই সামান্য উপহারে সন্তুষ্ট সেই মানুষগুলোর আনন্দময় হাসিমুখ দেখলে মনে হয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর থেকে বড় সুখ বোধহয় আর কোথাও নেই।

যখন মানুষের কাছে প্যাডম্যান হিসেবে অক্ষয়কুমার পরিচিতি লাভ করেনি, তখন আমাদের সতীর্থরা চিন্তা করেছিল আরশি প্রজেক্টের কথা। চা বাগানের আর গ্রামের পিছিয়ে পড়া ছাত্রীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিক্ষিত করা, এমনকি

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

কিভাবে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরী করা যায় সেটাও তাদের হাতেকলমে প্রজেক্টর সহযোগে শিখিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রজেক্টের জন্য প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল আমাদের সতীর্থদের। যদিও অতিমারীর জন্য বর্তমানে এই প্রজেক্ট বন্ধ আছে, আশা করা যায় অদুর ভবিষ্যতে সবকিছু স্বাভাবিক হলে আবার এই প্রজেক্টের কাজ শুরু হবে।

জন্মলগ্ন থেকেই সতীর্থ প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষীর আশীর্বাদ ও সাহায্য সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনেক নতুন সদস্য সতীর্থতে যোগ দিয়েছেন ও এখনও দিচ্ছেন। সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে কোনও প্রজেক্টেই বাজেট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। দেশে ও বিদেশে, দূরদূরান্তে ছড়িয়ে থাকা সদস্যদের মধ্যে দুরত্বও কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন, তাকে জয় করার ক্ষমতা সতীর্থর আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সম্পুর্ণ অরাজনৈতিক ভাবে সতীর্থর এই যাত্রা চিরঞ্জীবী হয়ে থাকুক।

শুধু তোমায় ভালোবেসে

সঞ্জয়

বারবার আসি, বারবার যাই
শুধু তোমায় দেখার ছলে,
দেখি এক শ্রাবণে ভিজছ তুমি
কেমন অন্য শ্রাবণ জলে।
পুরু চশমার কাঁচ ভিজে যায়
পাঁজরে হাজার স্মৃতির ভিড়
স্মৃতির প্রবাহে কত কথা আসে
সে ঝর্ণাতে ভিজছি আনখশির।

হ্যাঁ, অন্য কিছু নয়। কথাগুলো আমার প্রাণের শহর মালবাজারের আমাদের স্কুল আদর্শ বিদ্যাভবনকে নিয়ে বলা। আজ অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি। তবু যেন কোনো এক অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে আছি এই স্কুলের সাথে। আর সেখান থেকেই মনের টানে যুক্ত হওয়া 'সতীর্থ মালবাজার'এর সাথে।

সালটা ২০১৬ হবে - আমাদের অগ্রজ মৃণালদা আমাকে একদিন জানাল এই সংস্থার কথা। এরপর সুপর্ণা যোগাযোগ করে। জানতে পারি কী উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্থাটি তৈরি হয়েছে। তবে যখন জানতে পারলাম, এই সংস্থার সভাপতি সুশান্ত কুমার দত্ত স্যার, মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না। যোগদানের বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেদিনই।

প্রধানত আদর্শ বিদ্যাভবন এবং সুভাষিণী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই এই সংস্থা গড়ে উঠেছিল। আর সংস্থার বালি-পাথর-সিমেন্টের কাজ করেছিল সকলের অনুরাগ তার স্কুলের প্রতি। প্রথমদিকে সদস্য সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ফলে সামান্য সংখ্যক সদস্য দিন-রাত এক করে কাজ করে গিয়েছে। প্রচুর প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। আবার তা শেষও

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

করা হয়েছে সুষ্ঠভাবে। আজ সদস্য সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়ে গেছে। সতীর্থ মালবাজার তার পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে। সাথে বেড়ে চলেছে কাজের পরিসর।

'সতীর্থ মালবাজার' আজ পরিচিত নাম মালবাজার এবং সন্নিকটস্থ অঞ্চলের শিক্ষা ক্ষেত্রে। শিক্ষা ক্ষেত্র ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সতীর্থ মালবাজার। বিগত ৫ বছরে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে সতীর্থ মালবাজার, তা বই দিয়ে হোক বা সোয়েটার দিয়ে বা খেলার সামগ্রী দিয়েই হোক। পাশাপাশি, সামাজিক দায়বদ্ধতায় সতীর্থরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কোভিড সময়ে দুঃস্থ পরিবারদের প্রতি। এর বাইরেও প্রচুর কাজ করেছে ও করছে সতীর্থ মালবাজার।

সতীর্থ অনেক দিয়েছে আমাদের সকলকে। অনেক দাদা-ভাই-বোন-বন্ধু ফিরে পেয়েছি, অচেনা মুখের সাথে নতুন সম্পর্কে জড়িত আজ আমরা অনেকেই। আর পেয়েছি ছাত্র-ছাত্রীদের হাসি মুখগুলো যা অমূল্য সম্পদ মনের কোটরে সাজিয়ে রাখবার জন্য। প্রতিটা প্রোজেক্ট দিনের শেষে একটা প্রগাঢ় শান্তি দিয়েছে মনকে।

ভালো থাকুক 'সতীর্থ মালবাজার', এগিয়ে চলুক জয়ধ্বজা।

যে পথ পেরিয়ে এসেছি

মালবাজার ও সংলগ্ন এলাকায় সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে অন্যতম পরিচিত একটি নাম সতীর্থ মালবাজার। শিক্ষার্থীদের কাছে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। অনগ্রসর-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমরা হাত বাড়িয়েই রেখেছি, ওরাও সেটা জানে; যেকোনো প্রয়োজনে ওরা সতীর্থদের কাছে আসে। আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি। প্রয়োজনের তুলনায় সামর্থ্য সামান্যই। তবু নানান চড়াই-উতরাই পার করে এক পা-দু'পা করে সতীর্থরা এগিয়ে চলেছে।

- **১লা অক্টোবর ২০২১:** সতীর্থ মালবাজার-এর পক্ষ থেকে ভিন্ন মাত্রার একটি অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। এই আনন্দ অনুষ্ঠানে গজলডোবা রেসলিং কোচিং সেন্টার (জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট রেসলিং এসোসিয়েশন) ও ওদলাবাড়ির অনাথ আশ্রম (রিভাইভাল মিশন, ওদলাবাড়ী) - এই দুই জায়গার খেলোয়াড় ও পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাদ্য, বই, নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছিল।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

আমাদের সতীর্থ বন্ধুদের ও স্বেচ্ছাসেবীদের একনিষ্ঠ প্রয়াস ও সহযোগিতায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল গজলডোবার সঙ্গে ওদলাবাড়ীর অনুষ্ঠানটিও।

- **২৬শে অক্টোবর থেকে ১৬ই নভেম্বর ২০২১:** সতীর্থ মালবাজার-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মেধাবী অথচ অর্থনৈতিকভাবে প্রতিকূল ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ান। এবারেও সেইরকমই ৪৭জন ছাত্র-ছাত্রীকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ও সহায়ক পুস্তক বিতরণ করা হয়। করোনা অতিমারীর কারণে এই বছরের সব অনুষ্ঠানের মতো এই অনুষ্ঠানটিও আমাদের সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে করতে হয়েছে। প্রথম পর্বে বড়দীঘি হাইস্কুল(১০ জন) এবং ওদলাবাড়ি হাই স্কুল(১১ জন)- এর মোট ২১জন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বইগুলি তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে মাল আদর্শ বিদ্যাভবন(৩ জন), সুভাষিণী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়(৬ জন), পুষ্পিকা গার্লস হাই স্কুল(৭ জন) এবং সেন্ট বার্থেলোমিউ(বি এল) হাই স্কুল(১০ জন)- এর মোট ২৬জন ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের প্রয়োজনীয় বইগুলি দেওয়া হয়।

- **১৪ই নভেম্বর ২০২১:** শিশুদিবস উপলক্ষ্যে Lions Club of Mal (Distt 322 F Club No 041763) মালবাজারে যে ছোট বাচ্চাদের জন্য চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছিল, তাতে সতীর্থ মালবাজার সহযোগী হিসাবে যোগদান করে। সতীর্থ মালবাজার-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ওই শিবিরে যেসব বাচ্চার চশমার প্রয়োজন হবে, তা সতীর্থ মালবাজার জোগান দেবে।
শিশুদিবসে শিশুদের জন্য কিছু সেবামূলক অনুষ্ঠান করে আমরাও খুবই আনন্দিত। আগামীতেও আমরা এইরকম যৌথ উদ্যোগে সেবামূলক কাজ করার চেষ্টা করব।

- **২৩, ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২১:** ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (১. ওমর আলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫জন, ২. তেশিমলা IDTP প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৯জন, ৩. ICDS পূর্ব হায়হায় পাথার বিদ্যালয়ের ১৪জন, ৪. আইভিল বাসিনা লাইন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৯জন, ৫. বাল্মিকী শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৪৭জন) ২৩৪জন বাচ্চাকে শীত বস্ত্র হিসেবে স্কুলের সোয়েটার এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ব্যবহারের জন্য ছাতা দেওয়া হয়। খুবই সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি। বিশেষত রংবাহারি ছাতা উপহার পেয়ে শিশুরা আনন্দে আপ্লুত ছিল।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

- **৮ই জানুয়ারী ২০২২:** করোনাকালীন পরিস্থিতির কারণে আমাদের এই নিয়মিত প্রজেক্টটি প্রায় দু'বছর স্থগিত রাখা হয়েছিল। এই দিনে আমরা নিউগ্ল্যাঙ্ক চা বাগানের প্রায় ২০০জনকে পুরোনো অথচ ব্যবহারযোগ্য জামাকাপড় বিতরন করি।

- **১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০২২:** সতীর্থ মালবাজার মাল ব্লক তথা উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীক। খুবই আনন্দের খবর যে, এবারে আমরা দক্ষিণবঙ্গেও পাড়ি দিয়েছি। কলকাতার গড়িয়ার ব্রহ্মপুরের সেভ দা অরফান্স নামে এক অনাথ আশ্রমের ৫০জন বাচ্চাকে স্কুলের জুতো ও মোজা দেওয়া হয়। তার সাথে পেন্সিল, রাবার, পেন্সিল বক্স, রঙ পেন্সিল ও দেওয়া হয়েছে। ওখানে থাকা ২০জন বয়স্ককে কম্বল দেওয়া হয়েছে। এবং ওদের সকলের জন্য সেই দিনের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সতীর্থ মালবাজার-এর ১৭জন সদস্যও সেদিন ওদেরকে সাথে নিয়ে দুপুরের আহারে অংশগ্রহণ করে। ওখানকার বাচ্চারা নাচ-গানের মাধ্যমে আমাদের মনোরঞ্জন করে।

যে পাহাড় ডিঙাতে চাই

নিজেদের লক্ষ্য স্থির রেখে হাতে হাত ধরে সতীর্থরা আগামীতে আরো অনেক পাহাড় ডিঙাতে চাই, শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও দু'পা এগিয়ে দিতে চাই আমাদের উত্তরসূরীদের।

- সতীর্থ মালবাজার এর প্রধান ও নিয়মিত কর্মসূচি বুক ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মাল ব্লকের অন্তর্গত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তক ও শিক্ষা-সামগ্রী দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চায় সতীর্থ মালবাজার।
- অর্থনৈতিক অনগ্রসর কয়েকজনকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা (vocational training) প্রদানের ব্যবস্থা করে তাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করতে চাই।
- আমাদের আরও একটি অন্যতম কর্মসূচী হল প্রজেক্ট ARSHI (আমাদের ঋতু শিক্ষার ইতিবৃত্ত / Adolescent Reproductive Sexual Health Inauguration)। আমরা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের মাসিক ঋতুচক্র সম্বন্ধে সুস্থ-স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দিয়ে থাকি। এই সময়ে কীভাবে মেয়েরা স্বাস্থ্য বিধি মেনে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখবে এবং কীভাবে পূনর্ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের প্যাড নিজেরাই বানাতে পারবে সেই বিষয়ে আগামীতেও আমরা নানাবিধ কর্মশালার ব্যবস্থা করতে চাই।

সতীর্থ মালবাজার এর মুখপত্রিকা সাঁকোর বর্তমান সংখ্যার জন্য আমরা আশাতীত সাড়া পেয়েছি। এই সংখ্যায় যারা আছেন এবং যাদেরকে আমরা এবারে সাঁকো তে সামিল করতে পারলাম না, সকলকেই আগামীতেও পাশে চাই। আশা রাখি, অপ্রতিষ্ঠিত লেখক / লেখিকা / শিল্পীদের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজে আমরা সকলে মিলে একের পর এক সাঁকো পার করব।

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সতীর্থ সদস্য তালিকা

সদস্য তালিকাঃ
(০৩-০২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত)

(প্রতিষ্ঠাতা সদস্য)
১. শ্রী সুশান্ত কুমার দত্ত (সভাপতি)
২. গৌতম বিশ্বাস
৩. ঝুমা বিশ্বাস চন্দ
৪. প্রসেনজিৎ চন্দ
৫. মৃণাল কান্তি রায়
৬. রতন সাহা পোদ্দার
৭. রৌহিন ব্যানার্জি
৮. সুব্রত মহান্ত
৯. সঞ্জয় দাস

(সদস্য)
১০. সাধন মহান্ত
১১. অরিন্দম চক্রবর্তী
১২. অনিরুদ্ধ ঘোষ চৌধুরী
১৩. অনিন্দ্য সরকার
১৪. অঞ্জনা সিনহা সরকার
১৫. অন্তরা দাস
১৬. অন্তরা দাশগুপ্ত সরকার
১৭. শ্রীমতি আলপনা সরকার
১৮. শ্রীমতি ইন্দিরা বিশ্বাস
১৯. ইন্দিরা সরকার
২০. শ্রীমতি ইতি পাল
২১. ইন্দ্রাণী মিত্র ঠাকুর
২২. উত্তম বিশ্বাস (কোষাধ্যক্ষ)
২৩. উজ্জ্বল সরকার
২৪. কুন্তল বসু
২৫. গাগরী চৌধুরী
২৬. গার্গী দত্ত
২৭. গৌতম সাহা
২৮. গোবিন্দ পাল
২৯. গোপাল পাল
৩০. চন্দ্রনিভ রায়
৩১. চায়না নাগ
৩২. জয়শ্রী রাহা
৩৩. জয়তী নন্দী
৩৪. টুলটুলি মালাকার
৩৫. ডঃ কাহিনী দত্ত
৩৬. ডঃ প্রণব কুমার সাহা
৩৭. ডঃ সংযুক্তা মালাকার
৩৮. তন্ময় রঞ্জন দাস
৩৯. পাপিয়া ঘোষ পাল
৪০. প্রিয়া দে
৪১. ফরিদা হুসেন
৪২. বাচ্চু প্রধান
৪৩. বাদল দাস
৪৪. বিবেক আগারওয়াল
৪৫. ভাস্বতী চৌধুরী (সম্পাদক)
৪৬. ভাস্কর চৌধুরী
৪৭. মহুয়া সাহা কুন্ডু
৪৮. মিতা দাস চক্রবর্তী
৪৯. মলি রায়চৌধুরী
৫০. মুক্তা মুখার্জী
৫১. রাহুল ঘোষ
৫২. রাজা দাস
৫৩. রাজা শর্মা
৫৪. রাকেশ দে
৫৫. রিভেকা সেনাপতি
৫৬. রূপম হালদার
৫৭. শতরূপা মুখার্জি
৫৮. শাশ্বতী সর্দার
৫৯. শাঁওলি দত্ত
৬০. শুভ্রা মিত্র বসু
৬১. শুভজিৎ গুহ চৌধুরী
৬২. সব্যসাচী ঘোষ
৬৩. সম্পা সাহা
৬৪. সমিত মন্ডল
৬৫. সন্দীপ ভট্টাচার্য
৬৬. সংঘমিত্রা বসু
৬৭. সংঘমিত্রা রায় মালাকার
৬৮. সংগীতা রায়
৬৯. সংহিতা বসাক
৭০. সঞ্জয় ভট্টাচার্য
৭১. সঞ্জয় সোম
৭২. সুব্রত ঘোষ
৭৩. সুদীপ্ত ঘোষ
৭৪. স্নেহাশিস সরকার
৭৫. সুজাতা দাস বিশ্বাস
৭৬. সুমন নন্দী
৭৭. সুনীতা সাহা
৭৮. সুপর্ণা সাহা
৭৯. সুরজিৎ চন্দ
৮০. সুরূপা ঘোষ
৮১. সুস্মিতা চক্রবর্তী
৮২. স্বাতী গুপ্ত
৮৩. মলয়া দাস পাল
৮৪. ঐন্দ্রিলা সাহা
৮৫. দেবদত্তা ঘোষ
৮৬. গৌরব চ্যাটার্জী

স্বেচ্ছাসেবকঃ
১. অনিকেত গুহ
২. অর্ণব গুহ
৩. অভয় দত্ত
৪. গৌরব দে
৫. নয়ন রায়
৬. প্রীতম চক্রবর্তী
৭. প্রীতম মজুমদার
৮. বিশ্বজিৎ সেন
৯. মোস্তাফিজুর আহমেদ

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

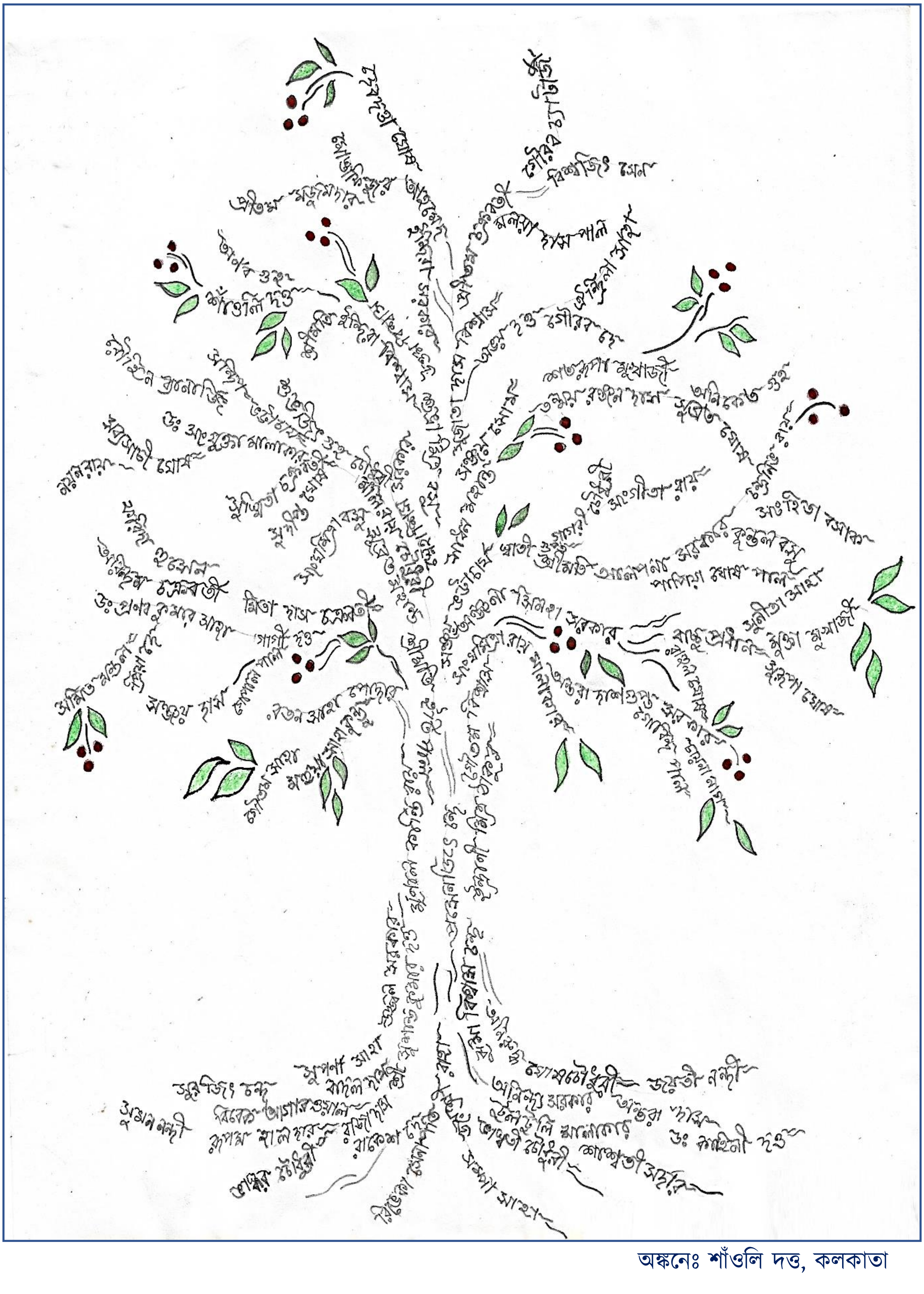

অঙ্কনেঃ শাঁওলি দত্ত, কলকাতা

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সাঁকো'র জন্য শুভেচ্ছা সহ-

SAHANA
SANSKRITIK KENDRA SILIGURI
Ph. +91 98323 84598

সতীর্থ মালবাজার এই পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করে। বিনা অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশ বা মুদ্রণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

SCM Data Insights

1800-419-1373
www.scmdatainsights.com

Join Our Team - **'Be a SCM-er'**

SCM Data Insights

Build Your Career

around Dignity, Passion and Joy

Logistics Data Simplified

We understand the logistics industry, help cost savings and provide value driven services

Shipment Cost Savings

Lower shipping bills due to audit monitoring and process improvement

Knowledge Matters

Greater access to supply chain knowledge repository and expanded service

Analytics Driven Decision Making

Utilize the power of Analytics to automate decision making of contract management

Support Across the Globe

Providing services to international Customers in an onsite-offshore model

CONTACT US

Supply Chain Analytics & Operation

1800-419-1373

email:
contact@scmdatainsights.com
www.scmdatainsights.com

Move ahead with the power of Data & Analytics